চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ের ফুল

গ্রন্থপীঠ
২০৯, কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩২৭

নূতন শোভন সংস্করণ জন্মাষ্টমী ১৫ই ভাদ্র ১৩৬৮

প্রকাশক কোরক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপীঠ ২০৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর জিতেন্দ্রনাথ বসু দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১ মোহনবাগান লেন কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ ব্লক কলার স্টুডিও ৪২ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ফাইন প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ ৪২ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন টাকা

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্র

শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়ের

করকমলে

বিয়ের ফুল

॥ ১ ॥
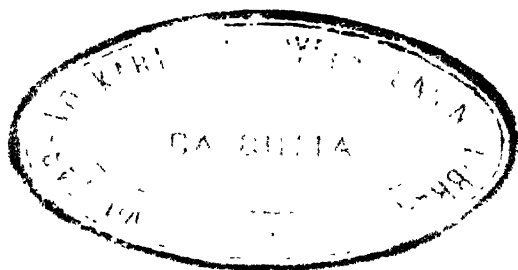
কলিকাতার সরু একটা গলির ভিতর ছোট্ট একখানা বাড়ীর ছোট্ট একটা ঘরের পাশে ছোট্ট একটুখানি খোলা চাতাল; কলিকাতার ভাষায় এই চারহাত চৌকা চাতালটিকেই ছাদ বলে। কূপের তলা থেকে উপর দিকে তাকাইলে যেমন মনে হয়, ঘেঁসাঘেঁসি চারিপাশের উঁচু উঁচু বাড়ীর দেয়াল-ঘেরা এই চাতাল বা ছাদটুকু হইতে উপর দিকে তাকাইলে তেমনি মনে হয়—যেন আকাশ লম্বা সরু চোঙার একদিকের ছিদ্রে তার একটি নীল চোখ পাতিয়া উঁকি মারিতেছে। এই ছোট্ট চাতালের উপর গুটি-কয়েক ফুলগাছ ত্রিশঙ্কুর মতন তেশূন্যে সৎমায়ের যত্নে মাহারা শিশুদের মতন টবের উপর বসিয়া মাথার উপরকার একফালি নীল আকাশের দিকে ফুলেরা হাসিমুখে তাকাইয়া থাকে; এই তেসাঁধির ভিতর আলো বাতাস খুব বেশী আসিতে পারে না—মাতালের মত সাত দেয়ালে ধাক্কা খাইয়া টলিতে টলিতে বাতাসের ঝলক মাঝে মাঝে ঠিকরাইয়া আসিয়া গাছগুলির পল্লব-অলকে একটু দোলা দিয়া ফুলের হাসিমুখে চিবুক ধরিয়া একটু আদর করিয়া যায়; সূর্যদেবের রথ থেকে ঠিক-দুক্কুর বেলা তাঁর রূপালী উত্তরীয় প্রান্ত মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গাছগুলির উপর দিয়া একটুখানি লুটাইয়া যায় আর তাতেই কৃতার্থ গাছগুলির আনন্দ ধরেনা, ফুলের হাসিতে তাদের মুখ ঝলমল করে,—যেন ম্যালেরিয়াজীর্ণ মা-মরা মরণাপন্ন শিশু মৃত্যুশয্যায় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে একটু আদর একটি নতুন খেলনা পাইয়া মরণকে হাসিয়া ভুলিতেছে। গাছ-গুলি মাতা ধরণীর বক্ষচ্যুত, পিতা আকাশের স্নেহবঞ্চিত ও ভাই

বাতাসের সঙ্গহারা হইয়া থাকিলেও তাদের মুখে ফুলের হাসির বিরাম ছিলনা তাদের ধাত্রীর প্রাণঢালা যত্নে।

গাছগুলি যার যত্ন পাইয়া সকলরকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাসিমুখে সুখের প্রলাপ ফুটাইয়া তুলিত, সেই মেয়েটিও ছিল তাদেরই মতন জগতের সহিত সম্পর্করহিত টবে-আজ্জানো ফুল-গাছেরই মতন। যে ঘরের পাশে ঐ ছাদটি, সেই ঘরের সে ভাড়াটে, থাকে অচেনা অজানা অনাত্মীয় লোকের বাড়ীতে। তার নাম সেবা, বয়স আঠারো-উনিশ, চেহারা সাধারণ বাঙালী মেয়ের যেমন হইয়া থাকে—আহামরিও নয় কুৎসিতও নয়—রঙটা মেটে, কাক-জ্যোৎস্নার মতন; গড়ন ছিপছিপে অথচ গোলগাল তাই তাকে একটু ঢেঙা লম্বা মনে হয়; ওরই মধ্যে চোখ দুটি একটু টানা টানা, নাকটি টিকলো, ঠোঁট দুখানি পাতলা, হাতের আঙ্গুলগুলি আগার দিকে ছুঁচলো, ঈষৎ উল্টানো, পায়ের পাতা দুখানি পাতলা; এ সবের উপরে ছিল তার মুখে ধী ও শ্রী, চোখে ছিল চঞ্চলতা, ঠোঁটে ছিল হাসি, হৃদয়ভরা ছিল মমতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বভাব ছিল কর্মঠ, আর অভ্যাস ছিল ফিটফাট; তাই তাকে দেখিলেই মনে হইত, বাঃ, বেশত মেয়েটি! সে খড়কে ডুরে শাড়ীই পরুক কি লাল কস্তাপেড়ে শাড়ীই পরুক সবতাতেই তাকে ভারী সুন্দর মানাইত, আর সে শাড়ী ব্লাউজ জুতা তিনটির রঙ ও ঢঙ মিল করিয়া পরিতে জানিত বলিয়া অল্পেতেই তার বেশ পরিপাটি হইয়া উঠিত। তার সখ ছিল কালের কালের রকম রকম ফুলের, তাই সে গোটাকয়েক টবে ফুলগাছ রোপিয়া ছাদটাকে বলিত বাগান! সে বই-এ পড়িয়াছিল—বিলাতে ছাদ-বাগানের চলন আছে; তাই তার এই দুশ্চেষ্টা; কিন্তু এইটুকু জায়গায় ঐ কটি গাছের ফুলে তার ফুলবাগানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ভরিত না।

ফুলবাগানের আকাঙ্ক্ষা মিটিবার তার সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। সে জন্মিয়াছিল মীরাটে, বড় হইয়াছিল কোয়েটায়, পৈতৃক বাড়ী

যে কোথায় ছিল সেও ঠিক জানিত না; তার আপনার বলিতে কেউ কোথাও নাই—অনাথা যাকে বলে। শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিলেন তার বাবা—ছিলেন কমিশেরিয়েটের সামান্য গোমস্তা, অত্যন্ত গরীব মানুষ, দুঃখিনী মা-মরা মেয়ে আদর যত্ন পায় এমন ভালো ঘরের সুপাত্র কিনিবার মতন পণের সঙ্গতি তাঁর ছিল না; যে-সে লোকের হাতে মেয়ে ফেলিয়া দেওয়ার চেয়ে মেয়ে আইবড় থাকে সেও ভাল মনে করিয়া তিনি মেয়েকে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন নাই; তিনি মারা গেলে অনাথ মেয়ে যাতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে ও ভদ্রভাবে থাকিয়া নিজের খরচ নিজেই উপার্জন করিয়া লইতে পারে এজন্য তিনি মেয়েকে কোয়েটায় এক মিশনারী মেমের কাছে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন।

বাবার মৃত্যু হইলে সেবা কলিকাতার এক মেয়েস্কুলে চাকরী সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে; আশ্রয় লইয়াছে স্কুলের কর্ত্রীর পরিচিত আনন্দবাবুর বাড়ীর এই একখানি ঘর ভাড়া লইয়া এবং আহারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে ঐ ভদ্রলোকেরই সংসারে খরচ দিয়া। ছাদখানি সে পাইয়াছিল ফাউ; এই ছাদটুকু পাইয়া সেবা বর্তিয়া গিয়াছিল; এইখানে টবে সে গোটাকতক ফুলগাছ লাগাইবার সুযোগ পাইয়াছিল; এই ছাদটুকুকেই সে অনুকল্পে বলিত বাগান।

সেবার শৈশবেই সে মা-ছোড় হইয়াছিল, আর তার বাবা যাইতেন আপিসে; একলা শিশুর সময় কাটিত এক সাহেবের বাগানের মালীর কাছে—সেবার বাবা মেয়ে আগ্‌লাইবার জন্য ঐ মালীর স্ত্রীর সঙ্গে মাস মাস কিছু দিবার চুক্তি করিয়া লইয়াছিলেন। সেই শৈশবে ফুলের সঙ্গে বড় হইয়া সেবার মনে যে ফুলের উপর টান হইয়াছিল তাহা তার স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল; মীরাট হইতে কোয়েটায় গিয়াও মিশন হাউসের হাতার বাগানের মধ্যেই সেবা স্থান পাইয়াছিল এবং তার শিক্ষয়িত্রীর

কাছে থাকিয়া তার শৈশবের পুষ্পপ্রীতি আরও বাড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল; মেমের কাছে মানুষ হওয়ার জন্যই সেবার স্বভাব হইয়াছিল ফিটফাট ও কর্মঠ এবং সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগী ও সেবাপরায়ণ আর তার মনের মধ্যে এই একটি বাসনা প্রবল হইয়া পাইয়া বসিয়াছিল—যেমন করিয়া হোক তার একটি বাগানঘেরা বাড়ী চাই। কিন্তু মেয়ে-স্কুলের নীচু ক্লাসের মাস্টারী করিয়া ত সে আশা মিটিবার সম্ভাবনা নাই; তাই তার মনের অপর সঙ্কল্প ছিল কোনোমতে টাকা জমাইয়া ডাক্তারী পাশ করিতে হইবে। সে আনন্দবাবু ও স্কুলের কর্ত্রীর সুপারিশ লইয়া স্কুলের ছুটির সময় হাসপাতালে সেবিকার কাজ শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে।

উদ্ভিজ্জের মধ্যে যেমন পদ্ম ও কচু জাতীয় গাছের পাতায় জল লাগে না, পাখীদের মধ্যে হাঁস জাতীয়দের পালখ যেমন জলে ডুবিয়া থাকিয়াও ভিজে না, তেমনি মানুষের মধ্যেও এমন লোক দেখা যায় যারা শৈশব হইতেই দুঃখের মধ্যে মানুষ হইলেও দুঃখ তাদের মনকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে না। সেবার ছিল এই রকমের প্রকৃতি। সে ছেলেবেলা হইতেই মৃত্যুর শোক ও অভাবের সঙ্কোচের মধ্যে থাকিয়াও হইয়াছিল সদানন্দময়ী, চঞ্চল, বচনবিন্যাস-পটু মুখরা; অথচ শোকের ও অভাবের ছায়ায় তার চরিত্রের আবেশ ও উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ মধুর ও নিতান্ত পরের প্রতিও আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে সে যেমন অতি সহজে পরের সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিত তেমনি অতি সহজে নিজেও অপরের প্রিয় হইয়া উঠিত।

সেবা স্কুল হইতে বাসায় আসিয়া তার ছাদবাগানের গাছে ঝাঁঝরি-ঝারি করিয়া জল দিতেছিল, টবে টবে মৌসুমী ফুলের বিচিত্র বাহার হাজার প্রজাপতির পাখার মতন দেখাইতেছিল, বিরহিনীর প্রণয়বেদনার মতন বড় বড় গোলাপের গন্ধে বাতাস

মন্দির হইয়া উঠিয়াছিল; তারই মাঝখানে বৃক্ষসেচনরতা সেবাকে যেন বসন্তলক্ষ্মীর মতন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

বুড়া আনন্দবাবু নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া বই পড়িতে-ছিলেন; ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ পাইয়া চোখ তুলিয়া সেবাকে ফুলের বনে বনদেবীর মতন, কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার মতন, পুষ্পস্তবকনম্রা লতার মতন আনত হইয়া বৃক্ষ পরিচর্যা করিতে দেখিয়া বুড়ার চোখ দুটিও সৌন্দর্য দর্শনের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি বইখানি পড়িবার জায়গায় আঙুল রাখিয়া বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সেবার বাগানের ধারে তাঁর জানলার কাছে আসিয়া বলিলেন—কি ভাই, শকুন্তলার বৃক্ষসেচন হচ্ছে।

সেবা একটু সোজা হইয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ দাদামশায়।

আনন্দবাবুর বয়স সত্তর উৎরাইয়া গিয়াছে, রঙ তাঁর কালো হইলেও সাদা চুল আর দাড়িতে তাঁকে একটি সৌম্যশ্রী দিয়াছিল, তার উপর তাঁর শান্ত কোমল স্বভাব, সরস রসিক স্নেহমধুর হৃদয়, জ্ঞানলাভের আগ্রহ এবং ধর্মনিষ্ঠা তাঁকে কলিকাতার বহু লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। সেবা এ বাড়ীতে আসিয়াই আনন্দবাবুকে দাদামশায় বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং রসিক বৃদ্ধ এই নবলব্ধ নাতনীটিকে নিজেরই নাতনীর মতন ভালোবাসিয়াছিলেন।

আনন্দবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—শকুন্তলার যে কেবল ভূতের বেগার খাটা হচ্ছে ভাই, দুষ্মন্ত ত একবারও উঁকি মারল না।

সেবা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কাজ নেই আমার এমন দুরন্ত দুষ্‌মনে যে বিয়ে করে স্বীকার করতে ভয় পায় আবার উল্টে স্ত্রীকে অপমান করে।

আনন্দবাবু বলিলেন—Twentieth Centuryর দুষ্মন্তরা আগের চেয়ে একটু bold আর gallant হয়েছে বোধহয়।

সেবা হাসিয়া বলিল—বোধ হয় রকমের অনিশ্চিতে লিপ্ত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আনন্দবাবু বলিলেন—তা বললে কি হয় ভাই? এই Life-টির তিন ভাগই যে lie আর অর্দ্ধেকটা if: তোমার বাগানে এত ফুল ফুটেছে, কত প্রজাপতি রঙীন পাখা মেলে ফুলের ঘটকালি করছে, তোমার বিয়ের ফুল কবে ফুটবে ভাই? প্রজাপতির ডানার রঙ মনের গায়ে কি লাগে নি?

সেবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না দাদামশায়, যার খেটে খেতে হয় তার মনে রঙটঙ লাগবার অবসর কোথায়? বিয়ের বিলাসের সখ নিষ্কর্মাদেরই হয়।

আনন্দবাবু জানলার উপর হাতের ভর রাখিয়া বলিলেন—কিন্তু ভাই আমারও যে ভয়ও হয়, লোভও হয় যে আমার এমন রূপে গুণে লক্ষ্মী নাতনীটি যদি চুরি যায় ত সে চুরিটা না হয় আমিই করি।

সেবা হাসিয়া বলিল—কে চুরি করবে দাদামশায়? রুক্মিণী-হরণ সুভদ্রাহরণ হয়েছিল যখন দেশে পুরুষ ছিল; চুরি করতেও ত উদ্যোগ সাহস চাই! চুরি যাব ইচ্ছে করলেও চুরি যাবার জো নেই এদেশে, যার সঙ্গে চুরি যাব তার বোঁচকা বেঁধে ট্যাকসি জোগাড় করে দিতে হবে আমাকেই। হয়ত ট্যাকসিতে চড়ে চোর ফেলবেন ভ্যাঁ করে কেঁদে! যদিই বা কেউ সাহস করে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যান, তা হলে তিনি বরপণের বায়না বোলে ট্যাকসি ভাড়াটা চাইবেন, কিম্বা গাঁটরীটি নিয়ে বেমালুম চম্পট দেবার চেষ্টা করবেন। দেশে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন চোরের মতন চোর যখন নেই আর আমার চুরি যাবার ইচ্ছেও নেই, তখন নির্ভাবনায় থাকতে পারেন দাদামশায়।

আনন্দবাবু বলিলেন—নির্ভাবনা হতে পারছি কই ভাই চোখের ওপর এমন রূপ দেখে।

সেবা হাসিয়া বলিল—বুড়ো বয়সে অত লোভ ভাল নয় দাদা-মশায়, ঠাকরুণদিদি শুনলে আপনাকে আদর করবেন না।

আনন্দবাবুর স্ত্রী মোহিনী হাসিতে হাসিতে আনন্দবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—সতীনের খোঁটার ভয় করিসনে ভাই, তুই তোর ঠাকুরদার সঙ্গে স্বয়ম্বরা হ।—আমি বুড়ো হয়ে গেছি আমি ত আর আদর যত্ন করতে পারিনে। বুড়োর সঙ্গে বুড়ীর ভারটাও নিস ভাই, সতীন বলে হিংসে করিসনে।

সেবা হাসিয়া বলিল—এ স্বয়ম্বরে আমার মন নেই ঠাকরুণ-দিদি। যে আমাকে ফুলের বাগান দিতে না পারবে তাকে আমি সাধলেও ফুলের মালা দিচ্ছি নে।

মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—তবে তুই একটা উড়ে মালীকে বিয়ে কর।

সেবা হাসিয়া বলিল—তাই করব ঠাকরুণদিদি; খোট্রা মালীর কাছ থেকে ফুল ভালবাসতে শিখেছি, উড়ে মালী যদি ফুলের বাগানে রাখে তবে তাকেই ভালবাসতে শিখব।

আরব্য উপন্যাসের সোনার কৌটার ভিতর থেকে দৈত্যের মতন, লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভিতর থেকে সাপের মতন, হাসির ভিতর হইতে অনাথার জীবনের অতীত স্মৃতির দুঃখ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়াই আনন্দবাবু ও মোহিনী বিমর্ষ হইয়া গেলেন। মোহিনী কথা চাপা দিবার জন্য বলিলেন—আচ্ছা মালী বৌ, এখন বাগান সেচা রেখে খাবে এস, কোন সকালে খেয়ে গেছ খিদে পায় না?

সেবা জলের ঝারিটা তুলিয়া লইয়া বলিল—এই যাই ঠাকরুণ-দিদি, এতক্ষণে ত হয়ে যেত, আপনার কত্তাটিই ত ঘটকালি করতে এসে আমার দেরী করিয়ে দিলেন।

আনন্দবাবু বলিলেন—তোমার কাজ সেরে নাও ভাই—উমেদার বর আর ঘটক এখন বিদায় হোক। আবার আসবে কিন্তু···

সেবা ঘাড় বাঁকাইয়া চোখে হাসিল। বুড়াবুড়ী হাসিমুখে জানলা

হইতে সরিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে মোহিনী আনন্দবাবুকে বলিলেন—নবগ্রাম থেকে চিঠি এসেছে—সুমতি দিদি লিখেছেন, হীরক কলকাতায় এসেছে সাঁতারের বাজি খেলতে।

আনন্দবাবু বলিলেন—ও। তবে একদিন সে হঠাৎ জেঠিমাকে উপদ্রব করে যাবে। সেবাকে দিয়ে কিছু খাবার টাবার করিয়ে রেখে দিয়ো···

সেবা গাছে জল দেওয়া সারিয়া ঘুরিয়া আনন্দবাবুর ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে নিজের নাম শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—কি দাদামশায় ? কার জন্যে খাবার করতে হবে, আমার বরের জন্যে ? কেউ শুভদৃষ্টি করতে আসছেন নাকি ?

আনন্দবাবু ঘাড় নাড়িয়া হাসিমুখে বলিলেন—না ভাই তার এই শ্রাবণ মাসেই বিয়ে দিয়েছি। আগে যদি তোমায় চিনতাম তা হলে ঘটকালি করতাম। সে তোমায় একটা কেন সাতটা ফুলের বাগান যৌতুক দিয়ে তোমার মালঞ্চের মালাকর হয়ে থাকত।

আনন্দবাবুর এক মরা মেয়ের দুটি ছোট ছোট মেয়ে দিদিমার কাছে মানুষ হইতেছিল ; মোহিনী বুড়ো মানুষ তাদের সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন না। সেবা ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল ছোটটির দুই নাক হইতে পোঁটা গড়াইতেছে এবং তার বড়টির হাতময় খোঁস পুঁজে ভড়ভড় করিতেছে। সেবা ছোটমেয়েটির নাক মুছিয়া দিতে দিতে আনন্দবাবুর কথার জবাব দিল—গতস্য শোচনা নাস্তি দাদা-মশায়। যার বিয়ে নেই অথচ ফুলবাগান আছে তেমন লোক যতদিন না জুটছে ততদিন আপনার ছাতের ফুলবাগানেরই গলায় আমি মালা পরাব।

মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা লো আচ্ছা, যদি কেউ এসে তোর মনের বাগানে বিয়ের ফুল ফুটিয়ে তোলে তখন কি করিস দেখা যাবে।

সেবা আনন্দবাবুর নাতনী ছুটির ছোটটিকে কোলে তুলিয়া ও বড়টির হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে হাসি মুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া গেল—উঁহু। যার বাগানে ফুল ফোটেনা সে আমার মনেও ফুল ফোটাতে পারবে না।

মোহিনী ডাকিয়া বলিলেন—ওলো! কোথায় চল্‌লি আবার? খেয়ে যা।

ঘরের বাহির হইতেই সেবা বলিয়া গেল—কণার খোস ধুইয়ে মলম লাগিয়ে আসছি ঠাকরুণদিদি।

॥ ২ ॥

নবগ্রামের জমিদার ভারতবাবু ছিলেন আনন্দবাবুর বন্ধু। ভারতবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হীরক এখন জমিদারীর মালিক। হীরকের মার নাম সুমতি; হীরকের অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, তার স্ত্রীর নাম রমা। হীরক ধনীর একমাত্র পুত্র হইয়াও সচ্চরিত্র বিদ্বান পরোপকারী, সৎকর্মে আগ্রহান্বিত, তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর কিন্তু তার মুখখানি ছিল এখনো কিশোর তরুণ বালকের মত সুকুমার, তার স্বভাবও ছিল বালকের মত চঞ্চল আনন্দময়; তার প্রকৃতি ছিল আবেগময়—সে একটু প্রতিবাদেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত আবার পরক্ষণেই অনুতপ্ত হইয়া লোকের কাছে নম্র হইয়া পড়িত। অলসতা তার কাছে প্রশ্রয় পাইত না— কলেজে পড়িবার সময় দৌড়ধাব খেলায় যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তার ঝোঁক এখনো দস্তুরমত ছিল—সে দেশের মধ্যে সাঁতারে ক্ষিপ্র, দৌড়ে দ্রুত, ক্রিকেট হকি ফুটবল টেনিস খেলায় দক্ষ, হাডুডু খেলায় ওস্তাদ এবং সে একজন পালোয়ান রাখিয়া কুস্তির কসরতও

আয়ত্ত করিতেছিল। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ ব্যায়াম ও নিরলস কর্মে সুগঠিত বাহুল্যবর্জিত মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল—দেহের গঠন ও রেখাবিন্যাস যেন ভাস্করের মানস-প্রতিমার মতন সুসমঞ্জস। পুরুষের মতন বলিষ্ঠ দেহে কিশোরের মতন আবেগময় অথচ সরল কোমল রমণীর মতন মুখখানি দেখিলে তাকে ভাল না বাসিয়া থাকা অসম্ভব হইত, তাই সে তার পরিচিত মাত্রেরই প্রিয়।

হীরক বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় সাঁতারের বাজি জিতিতে কলিকাতায় গিয়াছে; আজ তার নবগ্রাম ফিরিয়া আসিবার কথা। তাই মা সুমতি নিজে ছেলের ভালোবাসা খাবার গোকুল পিঠে ও পাটিসাপটা তৈরী করিয়া রসে ফেলিতেছিলেন, আর বধূ রমা তাঁর কাছে বসিয়া জোগাড় করিয়া দিতেছিল। সুমতি কাজ সমাপ্ত করিয়া একখানি রূপার রেকাবিতে চারখানি পাটিসাপটা ও গুটি আষ্টেক গোকুল পিঠে সাজাইয়া রেকাবি তুলিয়া বধূর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন—বৌমা, গরম গরম খেয়ে দেখত মা কেমন হয়েছে।

রমার সুন্দর মুখখানি আনন্দে ও লজ্জায় আরো সুন্দর হইয়া উঠিল, সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—আমিই আগে খাব মা, তা কি হয়?

সুমতি হাসিয়া বলিলেন—বেশ হয় মা বেশ হয়। তুমি হীরুর আগে খেলে হীরু সুখীই হবে।

রমা সুখের লজ্জায় লাল হইয়া মাথা নত করিয়া বলিল—আপনার জন্যে আগে তুলে রাখুন···

সুমতি হাসিয়া বলিলেন—আমার মা আগে খেলে আমার পরে খেতে কিছু দোষ হবে না মা, তুমি খাও ত।

রমা আর আপত্তি না করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। খাইতে খাইতে রমা হাসিমুখ তুলিয়া বলিল—বিয়ের পর যখন এখানে আসি মা, তখন আমার এক দিদি আমায় যে ভয় দেখিয়েছিল।

সুমতি রমার কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কৌতুকে উৎসুক হইয়া বলিলেন—কিসের ভয় মা ?

রমা আনন্দে ও লজ্জাতে মিশাইয়া হাসিয়া বলিল—সেজদি বলেছিল—শ্বশুরবাড়ী নয়ত রে যমের বাড়ী! এই যে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী ছাড়ছ এই কান্না আর ছাড়বে না।

সুমতি হাসিয়া বলিলেন—তোমার দিদিকে তার শাশুড়ী বুঝি খুব যন্তর্ণা দেয় ? অনেক শাশুড়ীই ঐরকম, তাদের মনে থাকেনা না যে এককালে তারাও বৌ ছিল—আবার বৌয়েরা শাশুড়ী হয়েও ঐরকম বৌ-কাঁটকী হয়। কিন্তু তুমি যে আমার হীরুর বৌ, হীরু যে তোমায় খুব ভালবাসে, আমি কি তোমার মনে একটুও কষ্ট দিতে পারি মা ? সে কষ্ট যে হীরুর মনেই লাগবে! বলিতে বলিতে সুমতির চোখ ছুটি ছলছল করিতে লাগিল। স্বামীর সে সোহাগিনী—এই কথা শাশুড়ীর মুখে শুনিয়া সুখে ও লজ্জায় রমা আর কথা বলিতে পারিল না, সে মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। সুমতি বলিলেন—হীরুর আসবার সময় ত উৎরে গেল ; আজ আর এল না বোধহয়। এমন ছেলে যে একখানা চিঠিও দিলে না।

স্বামী আজ আর আসিবে না হয়ত এই আশঙ্কায় রমার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল, তার চোখ ছলছল করিয়া জলে ভরিয়া আসিল, সে মাথা নত করিয়াই খাইতে লাগিল—কোন কথা বলিতে পারিল না।

সুমতি একটা মীট-সেফের ভিতর খাবারগুলি তুলিয়া রাখিতেছেন, হীরক পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিল। রমা মুখ তুলিয়া স্বামীকে দেখিতে পাইতেই তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা তুলিয়া হাত গুটাইয়া বসিল, হীরক চোখ টিপিয়া ইসারায় বারণ করিল, রমা যেন কোনরকম করিয়া তার আগমন মাকে জানাইয়া না দেয়। হীরক আঙুলের উপর ভর করিয়া সন্তর্পণে

গিয়া মার দুই চোখ চাপিয়া ধরিল। মা ছেলের ছেলেমানুষী বেশ ভালো করিয়াই চিনিতেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন—হীরু এলি?

হীরক মার চোখ ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—হীরু এল অমনি টের পেয়ে গেলে। একদিনও কি মনে করতে নেই ওপাড়ার মটরা এসে চোখ টিপে ধরেছে!

ছেলের ছেলেমানুষী খেলাতে খুসী হইয়া সুমতি বলিলেন—আমার হীরুর হাতের স্পর্শ যে আমি চিনি, মট্‌রা বলে ভুল হবে কেন? কলকাতা থেকে কোন্ গাড়ীতে আসবি কিছুই লিখিস নি, গাড়ীও পাঠাতে পারি নি। কিসে এলি?

হীরক প্রফুল্ল মুখে মার কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোমার ছেলে কি মা এখনও হাঁটতে শেখেনি, না সে খোঁড়া? এক ক্রোশ রাস্তা বইত নয়, আধঘণ্টায় মাড়িয়ে চলে এলাম। এ দুখানা শক্ত পা আছে কি জন্যে?

ছেলের পৌরুষে খুশী হইয়া মা বলিলেন,—সাঁতারের কি হল? জিতেছিস?

হীরক গর্বিতভাবে বলিল—জিতব না? এই দেখ মেডেল পেয়েছি।

হীরক পকেট হইতে একটা ছোট বাক্‌স বাহির করিয়া ঢাক্‌না খুলিয়া মার হাতে দিল। সুমতি সন্তান-সৌভাগ্যের গর্বে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, মেডেল জমল এক রাশ! হালি গেঁথে বৌমার গলায় পরিয়ে দিস!

হীরক অপাঙ্গে একবার পত্নীর দিকে চাহিয়া লইল, ঠিক সেই সময় রমাও আড় চোখে ঘোমটার মধ্য হইতে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল; সেই চকিত দৃষ্টির মিলনের সুখে ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া হীরক বলিল—তোমার ত কেবল বৌমা আর বৌমা?

কতরকম খাবার তৈরী করে খাওয়ান হচ্ছে কেবল ওঁকেই—আর আমার পেট যে চোঁ চোঁ করছে তার খবরই নেই। হীরক উঠিয়া স্ত্রীর সামনে বসিয়া তার পাত হইতে খাবার তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রমা তার স্বামীকে উচ্ছিষ্ট তুলিয়া খাইতে দেখিয়া শিহরিয়া মৃদু ভর্ৎসনায় খুব আস্তে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা ওকি ?

সুমতি হাসিতে হাসিতে আরো খাবার লইয়া রমার পাতে দিতে দিতে বলিলেন—আহা ওর মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছিস কেন ? তোর জন্যেও খাবার ঢের করেছি,—কত খেতে পারিস খা না।

হীরক স্নেহের ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—ডাক্তার তোমায় আগুন আঁচ লাগাতে বারণ করেছে না ? কে বলেছিল ঢের খাবার করতে ? কথা শোনা হয় না কেন বলো ত ?

সুমতি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—নে আর বাবার মতন বক্‌তে হবে না। এখন খা। আমি ফল ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।

হীরক রমার মাথার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিল—কলা-বৌ, ঘোমটা খোলো। বৌ-কথা কও।

রমা স্বামীর হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—আঃ! কি বেহায়াপনা করো। এখুনি মা এসে পড়বেন।

হীরক চোখ দুটি বাঁকা করিয়া ঘাড় কাত করিয়া হাসিয়া বলিল—মা ছেলের দরদ বোঝেন—তাই ঘর ছেড়ে যেতে যেতে জানিয়ে গেলেন ফল ছাড়িয়ে আনতে কিছুক্ষণ দেরী হবে।

রমা হাসিয়া বলিল—তা তুমি যেরকম বেহায়া। মার সামনে আমার সঙ্গে খেতে লজ্জা করল না ?

হীরক হাসিয়া বলিল—তা কি করি বলো। ক্ষুধা লেগেছিল অন্য রকমের, মার সামনে সেটা বিকল্পে সারা গেল। মা ত মিষ্টিমুখ করালেন, এখন তুমি মিষ্টিমুখ করাও।

রমা মুখ ফিরাইয়া আনন্দের বিরক্তি দেখাইয়া বলিল—আঃ কি যে করো। মা এখুনি এসে পড়বেন। যা খাচ্ছ তাই খাও।

হীরক বাঁ হাতে রমার মুখ ফিরাইয়া বলিল—আমি গডাঢড় চগুড়ের মটন ভুডও খাব টামাকও খাব।

হীরকের প্রস্তাবে রমার যে খুব আন্তরিক আপত্তি ছিল তা তার ব্যবহারে বোঝা গেল না। হীরক পত্নীকে গোকুল পিঠে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল এবং রমাও এই ভালোবাসায় ঋণী হইয়া রহিল না, সেও স্বামীর সকল ঋণ সঙ্গে-সঙ্গেই পরিশোধ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে বাহির হইতে সুমতির গলা শোনা গেল—বামা, দু-গেলাস জল দিয়ে যা ত মা, হীরু আর বৌমা খাচ্ছে।

রমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। হীরক গম্ভীর হইয়া অনেকগুলি গোকুল পিঠা মুঠি করিয়া মুখে পুরিয়া হাসি রোধ করিবার চেষ্টা করিল! কিন্তু তার মুখের চোখের প্রত্যেক রেখায় রেখায় হাসি আঁকা হইয়া রহিল। সুমতি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—বৌমা, তুমি হাত গুটিয়ে বসে থেকনা মা; তা হলে ঐ ডাকাত তোমায় কিছুই খেতে দেবে না; যা পারো কেড়ে কুড়ে নিয়ে খাও।

পিঠে-ভরা মুখে হীরক বলিল—তা বলতে হবে না মা, ঘোমটার তলে বেশ মুখ নড়ছে।

রমা চট করিয়া অপাঙ্গে একবার শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কুট করিয়া হীরকের হাতে চিম্‌টি কাটিয়া দিল। হীরক হঠাৎ আহত হইয়া উঃ করিয়া উঠিল। সুমতি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে?

হীরক অপ্রস্তুত হইয়া কটাক্ষে রমার দিকে চাহিয়া ঠোঁটের যে কোনটা রমার দিকে সেই কোনে একটু হাসিয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মতন বলিল—পিঁপ্‌ড়ে মা!

সুমতি ছেলের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় পিঁপ্‌ড়ে রে?

হীরক মাথা নিচু করিয়া বলিল—পিঠের সঙ্গে।

সুমতি তখনো না বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—টাটকা পিঠেতে পিঁপ্‌ড়ে এল কোত্থেকে?

রমা ঘোমটার ভিতর হইতে হাসি চাপিবার চেষ্টায় খুকখুক খুকখুক করিতেছিল। হীরক মার সঙ্গে আর মিথ্যা বলিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল—এই যে সামনে খুদি পিঁপ্‌ড়েটি পিঠের সঙ্গে আমায় দিয়েছো।

সুমতি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া খাবারগুলি গুছাইয়া তুলিতে লাগিলেন; খাবার তুলিতে তুলিতে হীরক আসিয়া পড়াতে খাবার তখন তোলা হয় নাই। অর্ধসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিতে করিতে সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে আনন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলি?

হীরক বলিল—গিয়েছিলাম মা, জেঠামশাইরা এখন আসতে পারবেন না। তাঁদের একটি নাৎনী জুটেছে—তাকে একলা রেখে আসতে পারবেন না।

সুমতি বলিলেন—নাৎনী ত বিমলার মেয়ে দুটি—রেণু আর কণা? মাছোড় কচি মেয়েদের কোথায় রেখে আসবেন? তাদের নিয়ে আসতেই ত বোলে দিয়েছিলাম। তুই বলিস নি?

হীরক বলিল—এ নাৎনীটি ওঁদের আপনার কেউ নয়, একজন ভাড়াটে, ওঁদের সংসারেই খরচ দিয়ে থাকে খায়। মেয়েস্কুলে চাকরী করে।

সুমতি বলিলেন—দেখেছিস তাকে? কেমন, কত বড়টি সে?

হীরক বলিল—আমি ত দেখিনি তাকে। আমি যখন গিয়েছিলাম। তখন সে স্কুলে গিয়াছিল। মেয়েটি বোধ হয় খুব ভালো—জেঠামশায় জেঠিমার মুখে ত প্রশংসা ধরছিল না।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়েটির বিয়ে হয়নি এখনো?

হীরক বলিল—বিয়ে হয়নি বোধহয়—কারণ ওঁরা বলছিলেন আমার বিয়ে না হয়ে গেলে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেন। সে যেরকম

চমৎকার খাবার করতে পারে চোখে দেখে এলাম, আর যে রকম গুণ ব্যাখ্যাও শুনে এলাম তাতে তাকে চোখে না দেখেও লোভ হচ্ছে বিয়ে করলেও হয়। বিয়ে ত মোটে একটাই হয়েছে আর একটা হলে এমনই কি বেশী হবে ?

হীরক স্ত্রীকে রাগাইয়া মান-ভঞ্জন করিবার কৌতুকসুখ উপভোগ করিবার জন্য কথাটা বলিয়াই চোখ বাঁকা করিয়া পত্নীকে একটি দৃষ্টির খোঁচা দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। রমা ঠোঁট ফুলাইয়া গর্জন করিয়া বলিল—যাও যাও, এখুনি বিয়ে করোগে যাও তাকে।

হীরক চুপি চুপি গম্ভীর ভাবে বলিল—তোমার যদি আপত্তি থাকে ত কেমন করে করি, সে ত শুধু আমারই বৌ হবে না, তোমারও সতীন হবে ত।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়েটির নাম কি? আপনার লোক কেউ নেই বুঝি ?

হীরক হাসিয়া বলিল—তা ত জানিনে মা, আমি ত সে-সব জিজ্ঞাসা করিনি। এর পরে যখন যাব তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসব না হয়। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

হীরকের কথা শুনিয়া সুমতি হাসিতে লাগিলেন।

শাশুড়ীর সামনে স্বামীর সঙ্গে অবাধে ঝগড়া করিতে না পারিয়া রমা ঘোমটার মধ্যে ঝাঁপি-ঢাকা সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল ; কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল না। সুমতি তাহা দেখিয়া হাসিয়া হীরককে বলিলেন—তোর খাওয়া হল ত উঠে যা— আর জ্বালাতন করিস নে। বৌমাকে খেতে দে।

হীরক উঠিয়া পড়িয়া কৃত্রিম অভিমান করিয়া বলিল—আমায় খেতে দেওয়া হলো না—আচ্ছা! তোমার ভালোবাসাটিকেই সব খাওয়াও।

এমন সময় হীরকের ছেলেবেলাকার খাস-খানসামা আসিয়া খবর দিল—ম্যানেজারবাবু একবার দেখা করতে চাচ্ছেন।

হীরক বলিল—বসতে বল, যাচ্ছি।

হীরক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রমা ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিল। সুমতি তার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—হীরুটা এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ আছে।

মার মন বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মার স্নেহের হিল্লোল বধূর প্রাণে গিয়া লাগিয়া তারও চিত্ত পুলকচঞ্চল করিয়া তুলিল।

॥ ৩ ॥

হীরক নিজের ঘরে বসিয়া একটি সোনার হারে মানানসই করিয়া তার জয়-করিয়া-পাওয়া সোনার মেডেলগুলি গাঁথিতেছিল। রমা ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীকে তারই ভূষণমণ্ডনে নিযুক্ত দেখিয়া হাসিমুখে হীরকের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। হীরক একবার মুখ একটু কাত করিয়া চোখ বাঁকা করিয়া হাসিয়া আবার মেডেল গাঁথায় মন দিল। রমা হীরকের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হচ্ছে এ?

হীরক হাসিমুখে বলিল—জানই ত মার হুকুম আমি অমান্য করতে পারি না। যেখানে মার হুকুম আমার আনন্দের সমর্থন পেয়েছে সেখানে আর বিলম্ব সয় না। তাই আমার বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য দিয়ে হৃদয়লক্ষ্মীকে বরণ করব।

হীরক একটা সাঁড়াসী দিয়া শেষ মেডেলটির কোঁড়া হারের সঙ্গে গাঁথিয়া রমার গলায় হারগাছি পরাইয়া দিল—প্রীতির আনন্দে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমা বলিল—যাই মাকে দেখিয়ে আসি।

হীরক বলিল—শুধু উপহার নিয়ে গেলেই হবে না, আমাকেও কিছু দিয়ে যেতে হবে।

উৎসুক কৌতুকের মাধুর্যে রমার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—কি চাই?

হীরক হাসিমুখে বলিল—ছুটি।

রমা স্বামীর প্রার্থনার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ছুটি? কিসের ছুটি?

হীরক মিনতির স্বরে বলিল—আজকের রাতটি আমায় ছুটি দাও, কাজ করতে হবে।

হীরকের কাজ মানে যে জমিদারীর কাজ তাহা রমা জানিত। রমা মুখ ভার করিয়া বলিল—চারদিন পরে কলকাতা বেড়িয়ে এসেই আজ আবার ছুটি চাই? না, তোমার রাত জাগতে হবে না।

হীরক একটু বিব্রত হইয়া বলিল—আমার উপহারের বদলে এই প্রার্থনা তোমার মঞ্জুর করা উচিত।

রমা হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আচ্ছা আমি মঞ্জুর করলাম। কিন্তু কেমন তুমি রাত জেগে কাজ করো দেখা যাবে।

হীরক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—লক্ষ্মীটি মাকে বোলো না যেন।

রমা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। হীরক বুঝিল সে মাকে বলিতেই যাইতেছে।

হীরক ডাকিল—লোকনাথ-দা!

লোকনাথ ঘরে আসিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—নালিশের বাক্স আনিয়েছিস?

হীরক হাটখোলার মাঝখানে একটা ছিদ্রকাটা বাক্স টাঙাইয়া দিয়াছিল; প্রজাদের মধ্যে কারো কোন নায়েব গোমস্তার বিরুদ্ধে নালিশ থাকিলে তারা যদি প্রকাশ্যে হীরকের সামনে না বলিতে পারিত তাহা হইলে নালিশ লিখিয়া সেই বাক্স-র মধ্যে ফেলিয়া যাইত। যারা দরখাস্তে নিজেদের নাম দিয়া নালিশ করিত তাদের নাম গোপন রাখিয়া হীরক অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকার করিত। বেনামী দরখাস্তেরও অনুসন্ধান ও প্রতিকারে সে অবহেলা করিত না।

এজন্য তার সমস্ত কর্মচারী ভয়ে ভয়ে থাকিত, কেউ অন্যায় অত্যাচার করিতে সাহস করিত না; এবং প্রজারাও সুখে নিরুপদ্রবে থাকিয়া হীরককে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত।

লোকনাথ বলিল—হ্যাঁ, বাক্স আনানো হয়েছে।

হীরক বলিল—বাক্সটা এইখানে দিয়ে যা, ম্যানেজারবাবু কতক-গুলো জরিপনক্সা পাঠিয়ে দেবে, সেগুলোও আমায় দিয়ে যাস্। আর বড় আলোটা জ্বেলে দিবি—তেল ভরে দিস—যেন সমস্ত রাত জ্বলে।

লোকনাথ চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—সমস্ত রাত জাগতে হবে বুঝি? তা হবে না—এই আজ কলকাতা থেকে এলে…

হীরক হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—তোকে যা বললাম তাই করগে যা—তুই মুনিব না আমি মুনিব?

লোকনাথ হীরককে জন্মাবধি কোলে পিঠে করিয়া অনেক ঝক্কি উপদ্রব সহিয়া এত বড় করিয়াছে, সে হীরককে ভালো করিয়াই চিনিত। সে আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লোকনাথ বাহির হইয়া যাইতেই হীরক নিজের অকারণ রাগের জন্য লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। তার স্নেহময় ভৃত্যের স্নেহের আশঙ্কাকে সে যে প্রভুত্বের দম্ভ দিয়া অপমান করিয়াছে এতে তার মন অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল তখনি লোকনাথকে ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু চাকরের কাছে ক্ষমা চাহিতেও তার লজ্জায় বাধিল। সে ভাবিল—সে আলো লইয়া আসিলে তাকে খুসী করিয়া দিলেই হইবে।

ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন সুমতি। মাকে দেখিয়াই হীরক তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছোট্ট মেয়ের মতন তাঁর গালে ধীরে ধীরে হাতের মৃদু আঘাত করিয়া আদর করিতে করিতে বলিল—তুমি কিছু বোলো না মা। তুমি জানো, তুমি বল্‌লে আমাকে শুনতেই হবে; কিন্তু সেটা ঠিক কাজ হবে না।

সুমতি হীরকের বড় বড় চুলগুলির ভিতর দিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—রাত জেগে কাজ করতে হবে, এমন কী জরুরী কাজ শুনি ?

হীরক বলিল—ম্যানেজারবাবু খবর দিয়ে গেলেন হাজার-টাকিয়ার জমিদারেরা হাজারটাকিয়া বিল থেকে একটা ডাঁড়া কেটে চঞ্চলা নদীর সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে। বিলের সব জল চঞ্চলাতে এসে পড়াতে চঞ্চলার জল ফেঁপে উঠছে ; তাতে পাথরকোলা গ্রাম বন্যায় ভেসে যাবার জোগাড় হয়েছে ; এর এক প্রতিকার আমাদের চিথোলমারী বিলের লক্‌গেট খুলে দিয়ে চঞ্চলার উদ্বৃত্ত জল সেই বিলে বইয়ে দেওয়া—তাতে কিন্তু অনেক ধান আর পাঠ ক্ষেত ডুবে যাবে ; এখন আমায় দেখতে হবে বিলে জল ভরলেই বেশী ক্ষতি হবে, না গ্রাম ডুবলেই বেশী ক্ষতি হবে।

সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হাজারটাকিয়ার বাবুদের বললে কি তারা জল নিষ্কাশ বন্ধ করে না ?

হীরক বলিল—বলা হয়েছিল, তারা শোনে নি, শেষে হয়ত লাঠিয়াল পাঠিয়ে শোনাতে হবে।

সুমতি ভয় পাইয়া বলিলেন—কাজ নেই বাপু দাঙ্গা ফ্যাসাদে। লোক বাঁচাতে গিয়ে লোক মরবে সে ত ঠিক নয়। তার চেয়ে ফসল নষ্ট হওয়াই ভালো, প্রজাদের যা লোকসান হবে সেটা খাজনা-টাজনা মাপ করে পুরিয়ে দিলেই হবে। বেশী রাত জাগিস নে তুই—এই কলকাতা থেকে কষ্ট করে এলি।

হীরক হাসিয়া বলিল—মা, তুমি কেবল নিজের ছেলেটিরই কষ্ট দেখছো—আর কত মায়ের কত ছেলের যে সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে তা দেখছ না। জমিদার ত মা প্রজার ভৃত্য। প্রজার বিপদের সময় জমিদার উদাসীন থাকলে তার নিমকহারামী করা হবে না ?

সুমতি ছেলের কর্তব্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া বলিলেন—না আমি তোকে বারণ করছি না, যত শীগগীর হয় কাজ সেরে শুয়ে পড়িস।

হীরক মার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—তবে এখন লক্ষ্মী মা হয়ে যাও ত। এতক্ষণ আমার অনেক কাজ হয়ে যেত। যত দেরী করবে তোমারই ছেলের শুতে তত রাত্তির হবে—আমার কি বলো না—বেশ হবে তোমার ছেলের রাত জেগে মাথা ধরবে, অসুখ করবে।

সুমতি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—আঃ! কি যে বকিস! তোর বকতে হবে না, তুই কাজ সেরে নে। আমি যাচ্ছি।

হীরক হাসিমুখে বলিল,—শুধু এক বচন নয় মা, বহুবচনে বলো—আমরা যাচ্ছি। নইলে তোমার পিছন থেকে যে এক চোখ দেখিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত করছে সে আমায় কাজও করতে দেবে না, ঘুমোতেও দেবে না। তোমার কাছে যে নালিশ করতে গিছল তাকে মিথ্যে নালিশের দায়ে আজকের রাতটা তোমার কাছেই বন্দী করে রাখগে।

সুমতি হাস্যপ্রফুল্ল মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—এস বৌমা, পাগলকে আর ক্ষেপিয়ো না।

রমা অপ্রসন্ন মনে শাশুড়ীর পিছন পিছন যাইতে যাইতে চট করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া প্রান্তরপারের দিগন্ত রেখার মতন সুন্দর ভ্রূ বাঁকাইয়া কিল উঁচাইয়া শাসাইয়া চলিয়া গেল। হীরক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আনন্দে কৌতুকে হাসিতে লাগিল।

লোকনাথ একটা প্রকাণ্ড আলো জ্বালিয়া লইয়া ঘরে আসিল এবং টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে উষ্ণস্বরে বলিল—এই নাও আলো—এক রাত কেন, তিন রাত জ্বলবে!

হীরক হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া ভৃত্যের পিঠে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—রাগ করিস নে ভাই লোকাদা। শুনেছিস ত পাথরকোলা গাঁয়ের বিপদের কথা।

লোকনাথ উষ্ণভাবেই বলিল—তা ত শুনেছি। কিন্তু ঐ যাঁরা মাসের মাস মুঠো মুঠো টাকা নিচ্ছেন সেইসব ম্যানেজারবাবুরা কি

করছেন? তাঁরা রাত জাগুন না! তাঁরা অতগুলোতে মিলে একটা বুদ্ধি ঠাওরাতে পারেন না?

হীরক চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিল—তারা ত ভাই আমার কাছে দুশো চারশো টাকা পায়; কিন্তু আমি যে প্রজাদের কাছ থেকে মাসের মাস পাঁচ সাত হাজার টাকা নি। কার গরজ বেশী ভাই?

লোকনাথ পরাস্ত হইয়া অস্পষ্টভাবে গজগজ করিয়া বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গেল, তার অসন্তোষ হীরকের কথাতেও গেল না এইটুকু বোঝা গেল।

হীরক পাথরকোলা গাঁয়ের ও চিথোলমারী বিলের ম্যাপ নক্‌সা জরিপী চিঠা কাগজপত্র ডিহিদারের রিপোর্ট খুলিয়া কি করিলে সবদিক রক্ষা হয় তার উপায় সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৃদ্ধ লোকনাথ প্রভুর কর্ম্মসমাপ্তির প্রতীক্ষায় ঘরের বাহিরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। কাছারীর ঘড়িতে যখন দুটা বাজিয়া গেল, চৌকিদার হাঁকিয়া গেল, চৌকিদারের ডাকে শেয়ালগুলা হুয়া হুয়া করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল, তখন লোকনাথ একবার ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল—তখনও হীরক টেবিলময় ছড়ানো কাগজের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া খসখস করিয়া কি লিখিয়া যাইতেছে। লোকনাথ হতাশ হইয়া হাই তুলিয়া সেইখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল।

বন্দিনী রমারও ঘুম হইতেছিল না। এক এক চমক ঘুমের পর হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তার মনে হইতেছিল 'এতক্ষণ তাঁর কাজ হয়ে গেছে হয়ত,' কিন্তু নিরুপায়ভাবে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেছিল। সুমতিরও ঘুম হইতেছিল না। তিনি রমার উৎকণ্ঠায় ব্যথিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া নীরবে তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন।

ভোরবেলা সুমতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, রমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া কান পাতিয়া অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নিশ্চয় হইল যে শাশুড়ী ঘুমাইতেছেন। সে তখন

আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল এবং পায়ের মল গোছের উপর তুলিয়া গুঁজিয়া সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিজের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল ঘরের দরজা জুড়িয়া লোকনাথ শুইয়া ঘুমাইতেছে। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না; সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতে হীরককে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, কিন্তু দেখিল মেঝের উপর হীরকের ছায়া পড়িয়াছে, তাতেই দেখা গেল সে তখনো চেয়ারে বসিয়া বসিয়া কাজই করিতেছে। রমা আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেমন ধীরে ধীরে আসিয়াছিল তেমনি সন্তর্পণে ফিরিয়া গিয়া শাশুড়ীর কোলের কাছে শুইয়া পড়িল। রমা উঠিয়া আসিতেই সুমতির ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। রমাকে চুপি চুপি ফিরিয়া আসিয়া শুইতে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, রমা কার সন্ধানে গিয়াছিল। তিনি রমার গায়ে হাত দিতেই রমা চমকাইয়া উঠিল। সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরু কি এখনো শোয়নি মা?

রমার মাথায় লজ্জার বাজ ভাঙিয়া পড়িল—সে যে স্বামী-সন্দর্শনের আগ্রহে গোপনে বাহির হইয়াছিল ইহা শাশুড়ীর কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াতে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে যেন হীরকের উদ্দেশ্যেই যায় নি, এমনি কৈফিয়তের ভাবে মৃত্নস্বরে বলিল—বোধ হয় শোন্ নি। ঘরে দাউ দাউ করে এখনো আলো জ্বলছে। ছায়া দেখতে পেলাম বসেই আছেন।

সুমতি রমার কপালে হাত দিয়া বলিলেন—এখনো রাত আছে মা, তুমি ঘুমোও।

রমা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

যখন বেশ ফর্সা হইয়া গেছে, কাক কোকিল ডাকিতেছে, লোকনাথ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর তুই হাতে চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একবার আড়ামোড়া ভাঙিয়া হীরকের ঘরে ঢুকিল। তাকে আসিতে দেখিয়াই হীরক মুখ তুলিল।

লোকনাথ বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—সকাল হয়ে গেল এখনো কি আলো জ্বলবে নাকি? সমস্ত রাতটা ঠায় বসে কেটে গেল।

হীরক চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িয়া দুই হাতের আঙুল মাথার চুলের মধ্যে চালাইয়া দিয়া ক্লান্তস্বরে বলিল--পণ্ডশ্রম। কিছু ঠিক হলো না। আমায় সেখানে যেতে হবে। লোকাদা, ম্যানেজার বাবুকে সেলাম পাঠিয়েদে।

লোকনাথ আলো নিভাইয়া ল্যাম্প তুলিতে তুলিতে বলিল—এত সকালে তোমার ম্যানেজার উঠেছে কিনা! তার ত তোমার মতন সারা রাত ঘুম হচ্ছিল না।

হীরক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা আচ্ছা একটু পরেই না হয় লোক পাঠাস্।

লোকনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রমা মুখ ভার করিয়া ঘরের স্নামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হীরক তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে রমাকে ধরিয়া ঘরে আনিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— রাগ নাকি?

রমা সাদা গোলাপের মতন গাল দুটি ফুলাইয়া বলিল—রাগ নয়, তোমার কাজের আবার ক্ষতি হবে!

হীরক হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল—কাল সমস্ত রাত পণ্ডশ্রম হয়েছে—না পেলাম তোমায়, না পেলাম উপায়। এখনি আবার পাথরকোলা ছুটতে হবে।

রমা তার কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর দৃঢ়তা চিনিত। সে মুখখানি ভয়ে ভাবনায় ব্যাকুল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল— এখনি যাবে?

হীরক দেখিল রমার পুষ্পকলির মতন চোখদুটি প্রগাঢ় প্রণয়ের আবেশে লালিম ও বিচ্ছেদ ভয়ে অশ্রুশিশিরসিক্ত হইয়া
হীরক রমার কাঁধে হাত রাখিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—লক্ষ্মী আমার, তুমি অমন কোরে আমায় নীরবে নিবারণ করো না, তাহলে আমি

যেতে পারবো না। অত লোকের বিপদ, তুমি কি আমায় থাকতে বলবে ?

রমা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল—তোমার না গেলে কি চলে না ?

হীরক জোর দিয়া বলিল—নিতান্তই না।

রমা বলিল—তবে আর বারণ করি কি কোরে ? তবে কাল সমস্ত রাত জেগেছো ; নেয়ে খেয়ে যেও।

হীরক বলিল—ভাত খেয়ে গেলে চলবে না ; আমি নেয়ে নিচ্ছি, তুমি মাকে বোলে কিছু জলখাবার নিয়ে এস।

রমা ঘর হইতে বাহিরে চলিল। হীরক হাসিয়া বলিল—মাকে গিয়ে লাগিয়ো না যেন। মার হুকুম আমার হয়ে তুমিই নিয়ে এস।

রমা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। সে হাসি বর্ষাসন্ধ্যার আলোকপ্রভার শেষ বিদায়ের মতন ম্লান, বেদনায় আর্দ্র।

সুমতি পূজা করিতে বসিয়াছিলেন। রমা একখানি রেকাবি হাতে করিয়া ম্লানমুখে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা ? হীরুর কাজ কি এখনো হয়নি ?

রমা বলিল—না, এখনই পাথরকোলা যাচ্ছে।

সুমতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—এখনি ? সমস্ত রাত জাগরণের পর না নেয়ে খেয়ে ?

রমা বলিল—আমি নাইতে বলে এসেছি। ভাত খাবার তর সইবে না. জল খেয়ে যাবে বল্‌লে।

সুমতি বলিলেন—তুমি এইখেনে জলখাবার দিয়ে হীরুকে ডেকে আনো।

রমা লজ্জামাখা হাসিমুখে বলিল—সে আপনার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে পাছে আপনি বারণ করেন যেতে। বললে, মার হুকুম তুমিই চেয়ে এনো।

সুমতি পুত্রের মাতৃবৎসলতায় প্রীত হইয়া হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাকে অভয় দিয়ে ডেকে আনো গে।

রমা ঠাঁই করিয়া জলখাবার দিয়া হীরককে ডাকিতে গেল। হীরক তখন স্নান করিয়া আসিয়া টেবিল-আয়নার সামনে বসিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। আয়নায় রমার ছায়া পড়িতে দেখিয়া হীরক বুরুশ দিয়া চুল চাপিতে চাপিতে বলিল—মা কি বললেন ?

রমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—ছুটি মঞ্জুর। মা তাঁর পুজোর ঘরে জল খেতে ডাকছেন।

হীরক ভয় করিতেছিল এই ছুটি পাইতে অনেক তর্ক বিতর্ক ওকালতী করিতে হইবে। এত সহজে ছুটি পাইয়া সে আশ্চর্য ও আনন্দিত হইয়া উঠিয়া পড়িল ও রমার সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে চলিল। মার ঘরে গিয়া হাসিয়া বলিল—এই ত লক্ষ্মী মেয়ে। আমি শিগগির ফিরে আসব মা।

হীরকের ভয় ও ভুলাইবার চেষ্টা দেখিয়া সুমতি হাসিয়া বলিলেন —শিগগির যাতে ফিরে আসিস তার ব্যবস্থা আমি করছি।—বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

এই আদেশ শুনিয়া রমার মুখে প্রভা-তরল জ্যোতি ঝকমক করিয়া উঠিল। হীরক মুখ ফিরাইয়া রমার দিকে চাহিল। সেই সময় রমাও অপাঙ্গদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল, তাতে তার চোখের কালো উজ্জ্বল তারা চঞ্চল হইয়া উঠিল, যেন কুবলয়কোষের মধ্যে মধুলুব্ধ ভ্রমর সঞ্চরণ করিতেছে! মাতার আদেশ ও পত্নীর উৎসাহে কৌতুক অনুভব করিয়া হীরক উৎফুল্লমুখে বলিল—ওকে কোথায় নিয়ে যাব মা, আমি যাচ্ছি কাজে।

সুমতি বলিলেন—কাজ ত তুই সারাক্ষণই করবি নে। ছেলে-মানুষ কোথাও বেরুতে পারে না, নিয়ে যা। পাথরকোলার কাছারী বাড়ীতে আমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে কতবার থেকেছি—নদীর পাড়ে চমৎকার সে বাড়ী।

সুমতি পরলোকগত স্বামীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তিনি স্বামীকে অল্পদিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, তাই

তাঁর স্বামী তাঁকে সঙ্গে লইয়াই ফিরিতেন। নিজের মন দিয়া তিনি বধূর মন বুঝিতে পারিতেছিলেন বলিয়াই পুত্রকে এই আদেশ করিলেন।

হীরক হাসিয়া বলিল—তবে তুমিই আর বাকী থাকো কেন, তুমিও চলো।

সুমতি বলিলেন—তুই যদি আমায় যেতে দিস্ তা হলে কি আমি তোকে ছেড়ে থাকি? আমাকেও নিয়ে চ না।

হীরক ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না তোমার গাড়ী-পাল্কীতে চড়া হবে না; বুকের ধড়ফড়ানি বাড়লে সে মুস্কিল হবে। এখন একটু ভালো আছ।

পুত্রের স্নেহাতুর আশঙ্কা দেখিয়া সুমতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আচ্ছ, আচ্ছা আমি যাব না; তুই বৌমাকে নিয়ে যা।

হীরক খাওয়া শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—তবে মা চটপট কোরে তোয়েরি হয়ে নিতে বলো: আমি মোটর আনতে বলিগে।

হীরক রমার দিকে একবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রমা উল্লাসে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

॥ ৪ ॥

চঞ্চলা নদীর বাঁধের ধারেই পাথারকোলা কাছারী-বাড়ী। তার হাতায় ফুলের বাগান; তার পিছনে ফলের বাগান। হীরক সমস্ত দিন তদারকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তবু রমার উল্লাসের অভাব নাই। চঞ্চলা নদী বাঁধের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া চঞ্চলা বালিকার মতন খরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; বাগানের বেড়ায় অপরাজিতা ফুল যেন নীল নীল চোখ মেলিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে জলের সেই ব্যস্ত গতি দেখিতেছে। রমা সমস্ত দিন নায়েব গোমস্তাদের

বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া গল্প করিয়া বাগানে বাগানে বেড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়াও নিজের অজস্র আনন্দ ব্যয় করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না। যেন বাঁধা হরিণ শিশু তার বনবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ মেঘ করিয়া আসিল। মেয়েরা শঙ্কিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—কানায় কানায় ভরা নদী, এর ওপর জল ঝড় হলে বাঁধ উপ্‌চে না ভেসে যায়।

অপর একজন মনের শঙ্কাকে আশ্বাসে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—না, শরতের মেঘ, এখনি ভেসে চলে যাবে।

এই সান্ত্বনা সত্বেও রমার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল, সে উদ্বিগ্ন হইয়া সঙ্গের দাসীকে চুপি চুপি বলিল—লোকনাথ-দাদাকে বলগে ওঁকে ডেকে আনুক।

রমা সকলের কাছ হইতে বিদায় লইয়া কাছারী-বাড়ীর দোতলার উপর একলা চুপ করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়া হীরকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার কালো মেঘের অবগুণ্ঠনে নিবিড় হইয়া নামিয়া আসিতেছিল; রমার মুখখানিও ভয়ের ব্যাকুলতায় অমনি ম্লান অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছিল।

হীরক হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—টুনটুনি-পাখীর কি মেঘ দেখে ভয় করছে নাকি?

রমা জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি আমার কাছে থাকো। যদি ঝড় বৃষ্টি হয়—নদী উপ্‌চে আসে—

হীরক হাসিয়া বলিল—নদী উপচে এলেও দোতলায় তোমার নাগাল পাবে না। অধিকন্তু আমি বিলের লকগেট খুলে দিতে বলেছি—জল এখনি হু হু করে নেমে যাবে—কোনো ভয় নেই। সন্ধ্যে হয়ে গেল, বৃষ্টিও আসছে, নইলে তোমায় বিলে জল পড়া দেখতে নিয়ে যেতাম।

স্বামীর আশ্বাসবাক্যে নির্ভয় হইয়া রমা আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—কাল নৌকো কোরে নদী দিয়ে বিলে

বেড়াতে যাব। বিলে নাকি অনেক পদ্মফুল হয়েছে—আমি নিজের হাতে পদ্মফুল পদ্মচাকী তুলে আনব।

হীরক হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে। তোমার নিজের হাতে তোলা পদ্মফুলে আমাদের ফুলশয্যে হবে।

রমাকে কাছারী হইতে একঝুড়ি পদ্মফুল ভেট পাঠাইয়াছিল। রমা সেইগুলি দিয়া একটা মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সে সেই মালাছড়া আনিয়া হীরকের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—আজ আমাদের মাল্যদান, কাল হবে ফুলশয্যা।

হীরক নিজের গলার মালা খুলিয়া রমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল—ফুলের গলাতেই ফুল শোভা পায়। এ মালা তুমিই পরো।

হঠাৎ বাহিরে বিরহীর চাপা কান্নার মতন হু হু করিয়া ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুমদাম শব্দ করিয়া জানলা কপাট আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। জলের ঝাপটা ঘরের মধ্যে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল; সর্বত্র ব্যস্ততা ছুটাছুটি লাগিয়া গেল—চাকর দাসীরা কপাট জানলা বন্ধ করিতেছে, জিনিস সামলাইতেছে, পাইক পেয়াদারা ডাক হাঁক করিয়া পরস্পরকে সাবধান করিতেছে।

রমা ভয় পাইয়া হীরকের কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। হীরক রমাকে বাহুবেষ্টনে কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ভয় কি। শরতের বৃষ্টি বেশিক্ষণ হবে না।

ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। চঞ্চলা লক্ষ ঢেউয়ের হাততালি দিয়া রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছে। মেঘ বৃষ্টিধারার আঁচল উড়াইয়া উড়াপাক খেলিতেছে; বাতাস হুহুঙ্কার করিয়া গাছের মাথা ধরিয়া মাটিতে নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেছে—ধনুকের টঙ্কারের মতন গাছগুলা বিকট শব্দ করিয়া আবার সোজা হইয়া যাইতেছে এবং বেগ সামলাইতে না পারিয়া কোনোটার ডাল ভাঙ্গিতেছে, কোনোটার মূল ভাঙিতেছে, কোনোটা উৎপাটিত হইয়া পড়িতেছে।

হীরক শুষ্কমুখে বলিল—সাইক্লোন!

ঝড়—ঝড়—ঝড়—তুমুল ঝড়। লক্ষ কোটি দানব যেন রণে মাতিয়া হুঙ্কার করিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল। ফুঁয়ের মুখে কাগজের মতন ঝড়ের ধাক্কায় টিনের চাল উড়িয়া বজ্রাঘাতকে উপহাস করিয়া কড় কড় কড়াৎ শব্দে গাছের ডগায় গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ফুসের চালগুলাকে লইয়া ঝড় যেন ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল। কোঠাবাড়ীও মটমট শব্দ করিয়া ঝড়ের ঝাপটে দুলিতেছিল।

হীরক রমাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া বলিল—চলো রমা নীচে নেমে যাই।

রমা ভয়-পাওয়া পাখীর মতন নীরবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বামীর বুকের মধ্যে লাগিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। হীরক রমাকে লইয়া সিঁড়ির মাথায় আসিয়াছে, ঝড়ের একটা প্রবল ঝাপট আসিয়া বাড়ীতে লাগিয়া বোঁ-ওঁওঁ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর আধখানা ধ্বসিয়া হীরকের ও রমার উপর আছড়াইয়া পড়িল। বিকট কোলাহলের মধ্যে জানাও গেল না হীরক ও রমা চাপা পড়িয়া একটা কথা বলিবারও অবকাশ পাইয়াছিল কি না।

তখন সকলে নিজের নিজের ঘরবাড়ী ও প্রাণ পরিজন লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তথাপি দালান পড়ার শব্দে প্রথমেই দৌড়াইয়া আসিল লোকনাথ, এবং তার চীৎকারে পাইক পেয়াদা নায়েব গোমস্তা। তখন রাত্রি সবে নটা। হাঁক ডাক করিয়া লোক জড়ো করিতেই ঘণ্টাখানেক সময় গেল। তখন এমন জোরে ঝড় বহিতেছে যে কেউ কারো ডাকও শুনিতে পায় না, কেউ কাউকে ডাকিতেও যাইতে পারে না; খোলা জায়গায় দাঁড়াইলে বৃষ্টির ছাট যেন ছর্‌রার মতন আসিয়া গায়ে বিঁধিতেছিল; গাছ পড়া, চাল ওড়া, বাজ পড়া দেখিয়া নিজেও উড়িয়া পুড়িয়া যাইবার ভয়ে হৃৎকম্প হইতেছিল; তবু লোক জুটিল সেই বিষম দুর্যোগের মধ্যে অনেক। সকলের অগ্রণী বৃদ্ধ লোকনাথ। তার চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে, মুখে বিলাপের করুণ ক্রন্দনের বিরাম নাই, তবু সে

ক্ষিপ্তের মতন কোদাল ধরিয়া ধ্বসিয়া-পড়া বালি চুণ সুর্কি সরাইতেছিল। ঝড় জলে হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোও টিকিতেছিল না; সকলকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া কাজ করিতে হইতেছিল। তাই কাজ করিতে হইতেছিল ভয়ে ভয়ে—কোদাল শাবলের খোঁচা হীরক বা রমার গায়ে না লাগিয়া যায়। ঝড়ের ধাক্কায় একএকবার আধ-ভাঙা বাড়ী কাঁপিয়া হেলিয়া মট মট করিয়া উঠিতেছে এবং চাপা পড়িবার ভয়ে সব লোক একএকবার ছুটিয়া পালাইতেছে। কেবল লোকনাথের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রাণের মায়া নাই, দেবতার ভ্রূকুটি দেখিয়া ভয় নাই।

ঝড় জল থামিল তখন রাত্রি দুটা। সমস্ত রাত রাবিশ ইট কড়ি বরগা সরাইয়া হীরক ও রমার দেহ যখন বাহির হইল তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজকার উষাকে পক্ষীকাকলি আরতি করিয়া আবাহন করিল না, এ যেন দেবাসুরের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বিজয় গৌরবে চামুণ্ডার হাসি।

বৃদ্ধ লোকনাথ এতক্ষণ সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া যুবার মতন যুঝিতেছিল; হীরক ও রমার পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ দেহ যখন বাহির করিয়া পরিষ্কার জায়গায় আনা হইল তখন আর সে নিজেকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না—'ভাইরে একি হলো রে।' বলিয়া করুণ আর্তনাদ করিয়া সে হীরকের পাশে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং ক্লান্তি উদ্বেগ ও শোকে সেও মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

হীরক ও রমার দেহ দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল না জীবন আছে কিনা। তবু তাদের মরণ-আলিঙ্গন শিথিল করিয়া ঘরে বিছানার উপর শোয়ানো হইল, গায়ের ধূলা জলে ধোয়াইয়া মুখে চোখে জল দেওয়া হইতে লাগিল, লোকের পর লোক ছুটিল দিকে দিকে ডাক্তার ডাকিতে।

খবর গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। প্রজারা সব নিজেদের ধ্বংস-প্রায় ঘরকন্না মুমূর্ষু পুত্রকন্যা ফেলিয়া হায় হায় করিতে করিতে ছুটিয়া

আসিল। কাল যে গ্রাম জনপ্রিয় জমিদারের আগমনে আনন্দের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল, রাত না পোহাইতেই তাহা শ্মশানের হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কাছারির উঠানে শোকার্ত প্রজাদের ভীড় জমিতে লাগিল।

গেঁয়ো ডাক্তার আসিয়া তার অল্প বিদ্যা লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, তার ফলে এইটুকু বুঝিতে পারা গেল, হীরক বাঁচিয়া আছে, কিন্তু রমার জীবনের আর কোন চিহ্নই নাই। তখনই মোটর দৌড়িল নবগ্রামে; জমিদারী ডাক্তারখানার অ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জেনকে লইয়া আসিবে।

মোটর ফিরিতে বিকাল হইয়া গেল; আসিল ডাক্তার ও ম্যানেজার। ডাক্তার আসিয়া দেখিল রমার মৃত্যু হইয়াছে দম বন্ধ হইয়া, হীরকের মাথায় ও শিরদাঁড়ায় চোট লাগাতে তার চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে—মৃত্যু শীঘ্র না হইলেও জড়বুদ্ধি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকার আশঙ্কা আছে। ডাক্তারের শুশ্রূষায় অনেকক্ষণ পরে হীরক চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু চোখে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল না—কেমন ফ্যালফ্যাল করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

ডাক্তারের আদেশে রমার দেহ সেখান হইতে সরাইয়া লওয়া হইল, এবং ম্যানেজারের আদেশে চঞ্চলার তীরে হীরকের প্রিয়তমার দেহ ভস্মশেষ হইয়া গেল।

হীরকের জীবন আছে, জ্ঞান হইতেছে, শুনিয়াই লোকনাথ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। এবং একটু পরেই চোখের জল মুছিয়া হীরকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারের পরামর্শে হীরককে মোটরে শোয়াইয়া নবগ্রামে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। মোটরের উপর তক্তা পাতিয়া তারই উপর ধরাধরি করিয়া হীরককে শোয়ানো হইল সঙ্গে রহিল ডাক্তার ও লোকনাথ।

লোকনাথ মোটরে চড়িতে গিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বৌমাকে এখানে রেখে গিয়ে মার কাছে কেমন কোরে মুখ দেখাব? খোকাবাবুর জ্ঞান হলে বৌমাকে যখন খুঁজবে তখন তাকে কি বলবো?

ম্যানেজার ও ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাকে নিষেধ করিল—হীরকের জ্ঞান হইতেছে, এখন তার কাছে কিছু প্রকাশ করা ঠিক হইবে না।

লোকনাথ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

মোটর যখন নবগ্রামে পৌঁছিল তখন মোটরের শব্দ পাইয়াই সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরু ফিরে এল?

দুর্ঘটনার খবর সবাই শুনিয়াছিল, কেবল সুমতিকে শোনাইতে কেহ সাহস করে নাই। দাসী চলিয়া যাইতে যাইতে কান্নাচাপা স্বরে বলিয়া গেল—কি জানি।

সুমতি বাহির হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিতেই দেখিলেন চাকরেরা ধরাধরি করিয়া হীরককে উপরে তুলিয়া আনিতেছে। পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া একেবারে আড়ষ্ট আকাট হইয়া সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—লোকনাথ, কি হয়েছে রে?

লোকনাথ উপরে উঠিয়া আসিয়া মার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—কাল ঝড়ে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে মা।

সুমতি একবার ছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—প্রাণ আছে ত?

—প্রাণ ধুকধুক করছে। চৈতন্য কিছুই নেই। এ কি হলো মা?—বলিয়া লোকনাথ আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমতি আড়ষ্ট হইয়া শুষ্কমুখে বলিলেন—বৌমা? বৌমা কৈ?

লোকনাথ চাপা কান্নার মধ্যে কথা জড়াইয়া বলিল—সোনার প্রতিমাকে চঞ্চলার জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছি মা।

সুমতি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া সেখানেই শুইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁর ছিল হৃদ্‌রোগ; এই আঘাতে দুর্বল হৃদয় ক্লান্ত হইয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

অনেক তাছুতের পর যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি ক্ষীণ স্বরে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরু আমার বাঁচবে ত ?

ডাক্তার ভরসা দিয়া বলিল—প্রাণের কোনো ভয় নেই।

ডাক্তারের কথার স্বরে প্রাণের ভয় ছাড়া অপর রকম একটা আশঙ্কার আভাস ধরিতে পারিয়া সুমতি বলিলেন—তবে ?

ডাক্তার বলিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া সুমতি বলিলেন—আমার কাছে লুকোবেন না ; আমায় সমস্ত স্পষ্ট কোরে বলুন কি ভয় করছেন আপনি।

ডাক্তার বলিলেন—পক্ষাঘাত হবার ভয় আছে।

সুমতি ম্যানেজারকে বলিলেন—জেলা থেকে সিভিল সার্জনকে আনতে টেলিগ্রাম করুন। আর টেলিগ্রাম করুন আনন্দবাবুকে, কলকাতা থেকে দুজন বড় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে তিনি আসবেন। ডাক্তারবাবু, আমার হীরুকে ভালো করে তুলুন, আমার আর কেউ নেই।

সুমতি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার ও ম্যানেজার সান্ত্বনা দিয়া তাঁকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ডাক্তার বলিল—আপনার বুকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, এখন আপনি উতলা হলে অসুখ বাড়বে যে মা।

সুমতি বলিলেন—আমি এখন মোলেই যে বাঁচি বাবা। আমার ঘরের লক্ষ্মী বৌমা গেল, হীরুর অমন দশা হলো—এতেই আমার বুক যে ভেঙে যাচ্ছে।

ম্যানেজারবাবু বলিল—আপনি না থাকলে বাবুকে দেখবে কে ? এখন জ্ঞান ফিরে আসছে—এখন আপনাকে দেখতে পেলেও তাঁর মন অনেকটা সুস্থ হবে।

সুমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আমার বৌমা যদি থাকত তবে সে আমার হীরুকে ভালো কোরে তুলতে পারত। আমিই পোড়াকপালী আমার মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম।

হীরু যখন বৌমাকে খুঁজবে তখন তাকে কি বলব বাবা? বৌমা নেই শুনলে কি সে আর বাঁচবে?

সুমতি নিজে অনুরোধ করিয়া রমাকে হীরকের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁর মন তাই নিজেকে অপরাধী, তার মৃত্যুর কারণ বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল। তিনি আকুল ক্রন্দনে শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন—মা আমার ফিরে এস, ফিরে এস। তোমাদের বালাই নিয়ে আমারই যে আগে যাবার কথা মা। আমার হীরুর যে তুমি আনন্দখনি ছিলে। আমার একটু অসুখ হলে তোমার মুখ শুকিয়ে যেত, চোখের জল পড়ত। আজ তোমার মা মৃত্যুশয্যায় পোড়ে তোমায় ডাকছে, তুমি কোথায় মা?

কাঁদিতে কাঁদিতেই সুমতি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ঔষধ দিতে দিতে মুখ বিকৃত করিয়া ম্যানেজারকে বলিল—অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। টেনেটুনে এক আধমাস যদি রাখা যায়।

ম্যানেজার ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল—আর বাবু?

ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিল—বাবুরও অবস্থা ভালো নয়—ঐরকম জড় হয়ে পাঁচ সাত বছরও থাকতে পারেন।

ম্যানেজার ম্লানমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এমন সময় একজন চাকর আসিয়া ডাক্তারকে খবর দিল—বাবু চোখ তাকিয়েছেন।

ডাক্তার বলিল—চলো, আমি মাকে একটু সামলে রেখে যাচ্ছি।

হীরক চোখ মেলিয়া চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া যেন সমস্ত ব্যাপারটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকনাথ ইহা দেখিয়া উল্লসিত হইয়া হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ক্রন্দনকম্পিত স্বরে ডাকিল—খোকা, খোকা, ভাই।

হীরক এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বলিল—অ্যাঁ।

লোকনাথ যেন কৃতার্থ হইয়া বলিয়া উঠিল—আমায় চিনতে পারছিস ভাই?

হীরক মৃদুস্বরে বলিল—লোকাদা !

লোকনাথ আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না, সে দুই হাতে হীরককে জড়াইয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হীরক একটুক্ষণ অবাক হইয়া লোকনাথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—লোকাদা, রমা ? রমা কেমন আছে ? রমা কই ?

লোকনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিছন ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই আর শোক লুকাইতে পারিল না। ঘরের চৌকাঠ পার হইবার আগেই কাঁদিয়া ফেলিল।

হীরক চোখ বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে তীব্র স্বরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিল—লোকাদা !

লোকনাথ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হীরকের আরক্ত চক্ষুতে কঠোর দৃষ্টি দেখিয়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া আসিল ও মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাই ? অমন কেন করছ ?

হীরক কঠোর স্বরে বলিল—রমা কই বল্ ?

লোকনাথ থতমত খাইয়া কি মিথ্যা কথায় হীরককে শান্ত করিবে ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় ডাক্তার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তারকে দেখিয়াই হীরক রুষ্ট স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—ডাক্তারবাবু, আমরা দুজনে ছাত চাপা পড়েছিলাম, দুজনকেই যদি বাঁচাতে না পারলেন তবে আমায় কেন বাঁচালেন ? আমি ত দেখছি আমার হাত পা সব অবশ হয়ে গেছে। পক্ষাঘাতে আধমরা হয়ে থাকার চেয়ে আমার রমার সঙ্গে যাওয়া যে ভালো ছিল।

বলিতে বলিতে হীরক কাঁদিয়া ফেলিল।

হীরকের কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া খুসী হইয়া ডাক্তার বলিল—আপনি মার কথা ভাবছেন না ? আপনার শক্তি শিগগির ফিরে আসবে, আপনি ভয় করবেন না।

হীরক হতাশ ক্রন্দনের মধ্যে বলিল—আর শক্তি ! আমার যে

শক্তি ছিল সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আমি মার কাছ থেকে তাকে নিয়ে গেলাম, মাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারলাম না!—মাকে আমি মুখ দেখাব কেমন কোরে?

ডাক্তার বলিল—আপনি এত উতলা হবেন না। মার খুব ঘন ঘন ফিট হচ্ছে, আপনাকে কাতর দেখলে তাঁকে বাঁচানো যাবে না!

হীরক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—মা মা মা! ডাক্তারবাবু আমাকে মার কাছে নিয়ে চলুন—মাকে আমি দেখব।

ডাক্তার বলিল—এখন তাঁর কাছে গেলে তাঁর মন চঞ্চল হবে। কাল ভালো হয়ে আপনি নিজে হেঁটে তাঁর কাছে যাবেন।

হীরক আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার কান্নায় বাধা দিল না। ডাক্তার আশা করিতেছিল কান্নার আক্ষেপ বিক্ষেপে হীরকের আহত স্নায়ু শিরা অস্থি মজ্জা জাগ্রত সবল সতেজ হইয়া উঠিবে।

॥ ৫ ॥

আনন্দবাবু হীরকের ম্যানেজারের টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতার তুজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া নবগ্রামে আসিয়াছেন। ডাক্তারেরা হীরকের ঘরে প্রবেশ করিতেই তাঁদের সঙ্গে আনন্দ-বাবুকে দেখিয়াই হীরক একটু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এঁরা কে জ্যাঠামশায়?

আনন্দবাবু অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন—এঁরা ডাক্তার, তোমাকে দেখতে এসেছে বাবা।

হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—কে বললে আপনাদের এই সব উপদ্রব জোটাতে? আমি ভালো হতে চাইনে, আমি ভালো হবো না। রমা আমার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে গেছে—আমার নড়বার শক্তি নেই যে আপনাদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করি। আপনাদের পায়ে পড়ি, আপনারা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান…

হীরকের দেহ নিস্পন্দ নিশ্চল, অথচ তার মন অত্যন্ত উত্তেজিত বিচঞ্চল হইয়া কেবল তীব্র তীক্ষ্ণ কথায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

আনন্দবাবু নিকটে আসিয়া তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুজড়িত স্বরে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—বাবা, তুমি মৃত্যু কামনা করছ, কিন্তু তোমার এ অবস্থায় মৃত্যু যে শীঘ্র হবে তার ত কোন সম্ভাবনা নেই। এমন অক্ষম হয়ে পড়ে থাকা কি বাঞ্ছনীয়? তোমার মার কথা তুমি ভেবে দেখছ না? তুমি ভালো না হলে যে তোমার মা ভালো হবেন না।

মার নামে হীরকের মন দ্রব হইয়া গেল, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—মা মা মা!

ডাক্তারেরা সেই অবকাশে হীরককে পরীক্ষা আরম্ভ করিতেই হীরক আবার উগ্র উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি বলে আপনারা কি আমার কথা শুনবেন না? ম্যানেজারবাবু, এঁদের এখান থেকে যেতে বলুন।

রোগীকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইতে দেখিয়া ডাক্তারেরা ভয় পাইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি।

ডাক্তারেরা হীরককে যতটুকু দেখিবার অবকাশ পাইলেন তাতেই তাঁরা বুঝিলেন যে তার অবস্থা খুব খারাপ। তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াই জীবন কাটাইতে হইবে, এবং সেই জীবনের মেয়াদও পাঁচ সাত বছর বড় জোর। হীরকের বলিষ্ঠ শরীর বলিয়া আঘাত সহিয়া এখনো টিকিয়া আছে; চাই কি ভালো হইয়াও উঠিতে পারিত যদি বাঁচিয়া থাকিবার কোন লোভনীয় টান তার জীবনের প্রতি থাকিত। তার প্রিয় পত্নীর মৃত্যুর শোকে তার মন ব্যথিত হইয়া আছে, জীবনে সে আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছে না; এ অবস্থায় তার মা তার কাছে থাকিলেও অনেকটা সান্ত্বনা সে পাইত। কিন্তু তার মার অবস্থা তার চেয়েও সঙ্কটাপন্ন—এখন-তখন অবস্থা। এ অবস্থায় তাঁকে ছেলের কাছে লইয়া যাওয়াও উভয়ের পক্ষেই

বিপদসঙ্কুল ;—ছেলের অবস্থা দেখিয়া মা ও মার অবস্থা দেখিয়া ছেলে যে প্রবল দুঃখের আঘাত অনুভব করিবে তাতে দুজনেরই মৃত্যুকে ডাকিয়া নিকটে আনা হইবে। যদি একের সম্মুখে অপরের মৃত্যু ঘটে তবে ত কথাই নাই—সঙ্গে সঙ্গে অপরের মৃত্যু অনিবার্য হইয়া উঠিবে। ইহা একটি মস্ত বাঁচোয়া যে সুমতি বধূর শোকে হীরকের কাছে যাইতে চাহিতেছেন না; জ্ঞান হইলেই তিনি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া কেবলই বলিতেছেন—আমার ঘরের লক্ষ্মীপ্রতিমাকে আমি নিজের হাতে তুলে বিসর্জন করলাম। আমি এ মুখ হীরুকে কেমন কোরে দেখাব? বৌমা বেঁচে থাকলে যে হীরু আমার বৌমার যত্নেভালোবাসায় চাঙ্গা হয়ে উঠত। এখন হীরুকে আমার কে দেখবে।

সুমতির মনের মধ্যে এই সমস্যাটাই এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—পীড়িত হীরককে কে দেখিবে? তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ডাক্তারেরা যাই বলুক তাঁর আর বেশীদিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন তাঁর মৃত্যু না হইতেছে তত দিনও তাঁকে শয্যাগত হইয়াই থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় পীড়িত শোকার্ত অক্ষম হীরককে দেখিবে কে? মাইনে-করা চাকর-দাসী হাজার করিলেও যত্নে ত্রুটী ঘটিবেই; যেখানে আপনার বলিয়া টান নাই, মমতার দরদ নাই, সেখানে কেবল কর্তব্যের সেবা-যত্ন প্রাণের টানের অভাব পূরণ করিতে পারে না। হীরকের অর্থের লোভে অনেক আত্মীয় আসিয়া জুটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তারা হীরকের চেয়ে হীরকের অর্থের ও নিজেদের স্বার্থের যত্নই অধিক করিবে। এক লোকনাথ আছে—কিন্তু সেও ত শুধু মাইনের সম্পর্কে আবদ্ধ, তাতে আবার সে পুরুষমানুষ। হীরক যে শিশুর চেয়েও অসহায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এখন তার অভাব অনুভবে বুঝিয়া পূরণ করবার ক্ষমতা আছে শুধু মার, স্নেহপ্রাণ পত্নীর, অথবা মায়ের জাত কোনো আত্মীয় স্ত্রীলোকের। যেখানে যত আত্মীয় স্ত্রীলোক ছিল

সকলকেই একে একে সুমতি স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এমন কাউকেই তাঁর মনে হইল না যে তাঁর অথবা রমার স্থান অধিকার করিয়া হীরকের যত্ন করিতে পারিবে, যার শুশ্রূষা হীরক প্রসন্ন মনে সহ্য করিবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছে পক্ষাঘাত রোগ ইচ্ছাশক্তির অভাবের ফল; যদি হীরক শোক ভুলিয়া জীবনে আনন্দ অনুভব করে তবে তার রোগও সারিয়া যাইতে পারে। কি করিলে হীরকের মনে জীবনের মাধুর্য ও বাঁচিয়া উঠিবার আগ্রহ ফিরাইয়া আনা যায়? আহা, রমা যদি হীরকের মত পঙ্গু হইয়াও বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে তার জন্যেই হীরক চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিত, তার মনে রমার যত্নের আগ্রহ তাকে সুস্থ সবল করিয়া তুলিত। আর কাউকে দিয়া কি রমার স্থান পূরণ করা যায় না? যদি হীরকের আবার বিয়ে দেওয়া যায়? এমন পঙ্গু নিস্পন্দ মরণাপন্নকে মেয়ে দিবে কে? বাংলা দেশে মেয়ের অভাবও নাই, কোনো মূল্যও নাই, আইবুড়ো নাম খণ্ডাইতে পারিলেই মেয়ের বাপ মা বর্তিয়া যায়, এ ত আবার ধনী বর, বড় ঘর; হোক না বর শয্যাগত অস্পন্দ জড়, অনেক মেয়ে তার জন্য পাওয়া যাইবে এবং তার বাপ মা ও আত্মীয় স্বজন সবাই সমস্বরে বলিবে মেয়ে অনেক তপস্যা করিয়া চাঁপা ফুলে হর পূজিয়া তবে অমন বর ঘর পাইয়াছে। কিন্তু এই যে সব মেয়ে তারা ত সব খুকী বলিলেও হয়; তারা কি শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই স্বামীর দরদ বুঝিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিবে? হীরকই কি তেমন মেয়েকে বিয়ে করিতে চাহিবে? একটি এমন বড় মেয়ে পাওয়া যায় যার স্বভাব প্রকৃতি জানা আছে, যার মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যে নিজে বুঝিতে পারে ও যাকে বুঝিতে পারা যায়, যে সেবায় উৎসুক, মমতায় আগ্রহান্বিত, তবে হয়ত হীরককে রাজি করানোও যাইতে পারে। কিন্তু যার নিজের ভালোমন্দ বিচারের বয়স ও বুদ্ধি হইয়াছে সে হীরকের মতন স্বামীকে স্বীকারই বা করিবে

কেন এবং ভালোই বা বাসিতে পারিবে কেন? সবচেয়ে ভালো হয় যদি এমন একটি ভালো মেয়ে পাওয়া যায় যে প্রকৃতিতে স্নেহময়ী, স্বভাবে শান্ত ও সৎ, হীরকের সেবার ভার মাত্র গ্রহণ করিবে প্রথমে অর্থের অনুরোধে এবং ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইলে দুজনেই দুজনকে চাহিবে স্বার্থের টানে! কিন্তু জগৎ সংসারটা ত মানুষের ফরমাসে তৈরিও নয়, মানুষের ফরমাস মতন এখানে কিছু পাওয়াও যায় না, সব এখানে আগে হইতেই করিগরের খেয়াল-খুশিতে তৈরি হইয়া আছে, তারই ভিতর হইতে বাছিয়া লইতে হয়; যার কপাল ভালো তার মনের সঙ্গে মানান-সই হইয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশেরই জামার কাটছাঁট যেমন মনের মত হয় না, কোথাও কুঁচকাইয়া থাকে, কারো ঢল ঢল করে, কারো আঁট হয়—নিত্য বোতাম ছেঁড়ে, কেউ বা বোতাম টাঁকিয়া লয়, কেউ বা সুতা বাঁধিয়াই কাজ চালায়, কেউ বা হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দ্যায়—বুকের কাছটা খোলা হাঁ-হাঁ করতেই থাকে; কারো জুতো ঢল—ফস ফস করে, কারো বা আঁট—পায়ে প্রথম-প্রথম ফোস্কা পড়িতে থাকে, তারপর কড়া পড়িয়া যায়—কিন্তু তারও কি যন্ত্রণা কম।—তেমনি সংসারটাতেও অধিকাংশের ভাগ্যে মনের মতন মানান-সই অবস্থা জোটে না।

সুমতির মনের মধ্যে এই সমস্যা যত জটিল হইয়া উঠিতেছিল তিনি ব্যাকুল হইয়া রমার শোকে তত কাঁদিতেছিলেন—মা আমার, মা আমার, আমার হীরুকে তুই যে সাবিত্রীর মতন যমের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে বাঁচাতে পারতিস—সে অমৃত-শক্তি যে তোর প্রাণে ছিল মা!

বধূর মৃত্যুতে কোন শাশুড়ী এমন কাতর কখনো হয় নাই বোধ হয়। একে ত রমা সুমতির মেয়ের মতন প্রিয় ছিলই, এখন তার মূল্য আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল সুমতির আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ও হীরকের অসহায় অবস্থার সম্ভাবনায়। সুমতির ব্যাকুলতা দেখিয়া ডাক্তার চিন্তিত ভীত হইয়া উঠিতেছিল—বিকল হৃদয়যন্ত্র যে কোন মুহূর্তে স্থগিত অস্পন্দ হইয়া যাইতে পারে।

আনন্দবাবু সব শুনিয়া সুমতির ইচ্ছা বুঝিয়া একটুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—আপনি যে রকম মেয়ে খুঁজছেন ঠিক সেই রকম একটি মেয়ে আমার বাড়ীতে আছে ; কিন্তু তারা আপনাদের জাত নয়, এই এক মুস্কিল।

সুমতি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আর জাত। এখন জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে—বৈতরিণীর ঘাটে খেয়ামাঝি ত ডাকাডাকি করছে। হীরুই কি আর বেশীদিন বাঁচবে?—আমার বৌমা নেই, আমি থাকব না, ওকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? যে কটা দিন বিছানায় পোড়ে থাকবে সেই কটা দিন কেউ একজন তাকে আমার বোলে যত্ন করলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব, হীরুরও বাকী দিন কটা একটু আরামে কাটবে।

বলিতে বলিতে সুমতির চোখ দিয়া জল হুহু করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

আনন্দবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তা হলে আমি যাই, তাকে নিয়ে আসি গিয়ে যদি তার মত হয়।

সুমতি জোর দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন—যদি নয় বড়-ঠাকুর। তাকে আনাই চাই। সে গরিবের মেয়ে, অনাথা ; যদি তার পাত্র না জোটে তাকে ত চিরজীবন আইবুড়ো থেকে খেটে খেটে মরতে হবে? হীরুকে এখন আগ্রহ কোরে স্বামী বোলে স্বীকার করবার কথা নয় তা জানি ; কিন্তু হীরুর সমস্ত সম্পত্তির বদলে সে কি হীরুকে অল্প কটা দিনও আমার বোলে যত্ন করতে পারবে না?

আনন্দবাবু ব্যথিত হইয়া বলিলেন—সে বড় ভালো মেয়ে। তাকে যদি রাজি করাতে পারি, তা হলে হীরকের সেবা শুশ্রূষা যত্নের একটুও ত্রুটি হবে না।

সুমতি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—তবে আপনি আর দেরী করবেন না, আপনি যান, তাকে কালকেই নিয়ে আসুন।

আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরকের একবার মতটা জানলে হত না?

সুমতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না না, এখন নয়, মেয়ে যদি রাজি না হয় তা হলে হীরুর মনে কষ্ট হবে। আগে মেয়েকে রাজি কোরে নিয়ে আসুন, তারপর হীরুকে রাজি করার ভার আমার।

আনন্দবাবু সুমতির বিবেচনা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। মার স্নেহ যে কত সতর্ক, কত যে তার সূক্ষ্মদর্শনের শক্তি, তার পরিচয় পাইয়া আনন্দবাবু সম্ভ্রম-মুগ্ধ হৃদয়ে সেবার বিবাহের ঘটকালি করিতে যাত্রা করিলেন।

॥ ৬ ॥

আনন্দবাবুর নাৎনী রেণু আর অনু ঝগড়া করিয়াছে।

অনু দিদির সঙ্গে লড়াইয়ে না পারিয়া মেঝেয় পড়িয়া হাত-পা আছড়াইয়া ভয়ানক চীৎকার জুড়িয়াছে; আনন্দবাবুর স্ত্রী মোহিনী হিমসিম খাইয়া যাইতেছেন, কিছুতেই অনুকে মাটি হইতে তুলিতেও পারিতেছেন না, তাকে চুপ করাইতেও পারিতেছেন না। রেণু বোনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে লজনচুষ চুষিতে বসিয়া গেছে, বোন যে হাত পা আছড়াইয়া চীৎকার করিতেছে তার দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই—যেন সেই ঘরের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউ নাই।

সেবা স্কুল হইতে আসিয়া তার ফুলবাগানে জল দিতেছিল। সে অনুর ক্রমাগত চীৎকার শুনিয়া ঝারি নামাইয়া মোহিনীর ঘরে গিয়া ঢুকিল। তাকে দেখিয়া মোহিনী সোজা দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—মেয়ের রাগ আর কিছুতেই থামছে না।

সেবা হাসিয়া অণুর কাছে গিয়া বলিল—অণু লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি যদি আমার সঙ্গে আস অণু, ত তোমায় একটা মস্ত বড় লাল টকটকে গোলাপ ফুল দেবো, একটা বাঘের গল্প বলব; দিদি ত গোলাপও পাবে না, বাঘের গল্পও তাকে শুনতে দেওয়া হবে না।

সেবার বাগানের মোহন সুন্দর ফুলের উপর অনু ও রেণুর বিষম লোভ ছিল; কিন্তু তারা কিছুতেই তার একটি হস্তগত করিতে পারিত না। সেই লোভন সামগ্রী লাভের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া ও দিদির চেয়ে নিজের জিৎ হইবে ভাবিয়া অনুর অঙ্গবিক্ষেপ বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অতবড় প্রবল আন্দোলনের পর একেবারে হঠাৎ চুপ করাটা অশোভন হইবে বলিয়া অণুর চীৎকার একটানা সরু সুরে নামিয়া আসিল। সেবা ঝুঁকিয়া বলিল—চুপ করো অনু, চুপ না করলে দিদিও একটা গোলাপ পেয়ে যাবে।

রেণু এতক্ষণ অভিমানে সেবার দিকে না তাকাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বসিয়াছিল, মুখের ভিতর লজনচুষটা গলিয়া মিষ্টরসে তার মুখ ভরিয়া তুলিলেও সে গিলিতেছিলনা, এমনি তার উপেক্ষা। কিন্তু এখন অনু চুপ না করিলে সেও একটা গোলাপ পাইবে এ সম্ভাবনায় উৎসুক ও উৎফুল্ল হইয়া সে সেবার দিকে ফিরিয়া উৎসাহের সহিত লজনচুষ চুষিতে লাগিল। আর অনু, দিদিও একটা গোলাপ পাইয়া যায় দেখিয়া, কান্নার টানা সুরটাও হঠাৎ থামাইয়া ফেলিল এবং কান্না রোধ করিবার চেষ্টায় থাকিয়া থাকিয়া হেঁচকি তোলার মতন ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠাতে তার সর্বাঙ্গে আক্ষেপ হইতে লাগিল। সেবা অনুকে কোলে তুলিয়া হাসিয়া বলিল—অনু লক্ষ্মী মেয়ে। একটা গোলাপ আর একটা গল্প সে আজ পাবেই পাবে; আর অনু যদি বলে তবেই রেণুও পাবে।

রেণু কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু অমনি তার মনে হইল অনুকে খুসী করিতে পারিলে তারও পাইবার সম্ভাবনা আছে; তখন সে তার মুঠো খুলিয়া কাগজের মোড়ক সুদ্ধ লজনচুষগুলা

অনুর সামনে ধরিয়া বলিল—এই নে অনু, সব লজনচুষ। আমায় গপ্প শুনতে দিবি ?—গোলাপ ফুল দিতে দিবি ?

যে লজনচুষ লইয়া এত কাণ্ড হইতেছিল তার বেশীর ভাগ হস্তগত ত হইলই, অধিকন্তু যা কস্মিনকালে পাওয়া যায় না অথচ পাইতে লোভ হয় সেই গোলাপ ফুলও পাইবার সম্ভাবনা হইয়া গেল ও ফাঁকতালে একটা গল্পও শুনিতে পাওয়া যাইবে, এতে খুসী হইয়া অনু সেবাকে বলিল—বিবি-দিদি, দিদিকেও একটা ফুল দিয়ো···

মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—বিবি ভাই, তোর বশীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতা। নাতজামাই যদি দজ্জাল হয়, তা হলেও তোর ভয় নেই।

সেবা হাসিয়া বলিল—যারা পাকা সওয়ার তারা দুষ্টু ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করে। আমারও মনে হয় অশান্তকে বশ করার একটা আনন্দ আছে।

এমন সময় আনন্দবাবু ঘরে আসিয়া ম্লান মুখে হাসিয়া বলিলেন—এইবার তোমার বশ করার শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে বিবি।

সেবা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! দাদা মশায় যে! কখন এলেন ?

আনন্দবাবু হাতের ব্যাগ নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এই আসছি ভাই।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরকদের খবর কি ?

আনন্দবাবু বিষণ্ন হইয়া বলিলেন—বোসো, বলছি।

সেবা রেণুর হাত ধরিয়া অনুকে কোলে করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল। আনন্দবাবু ডাকিয়া বলিলেন—বিবি, তুমিও থাকো, তোমার সঙ্গেও পরামর্শ আছে।

সেবা আশ্চর্য হইয়া একবার আনন্দবাবুর দিকে তাকাইল এবং তার পরে অনুকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল—তোমরা এখন খেলা করোগে। আমি একটু পরে তোমাদের ফুল পেড়ে দেবো।

অনু ও রেণু দুজনে খেলা করিতে চলিয়া গেল। সেবা আসিয়া আনন্দবাবুর চেয়ারের পাশে পায়ের কাছে মাটিতে বসিল।

আনন্দবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—হীরক পরের জন্যে নিজের প্রাণ দিতে বসেছে।

এই কথা শুনিয়াই মোহিনী ও সেবা উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আনন্দবাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—হীরকের জমিদারীর একটা গ্রাম বন্যায় ভেসে যাবার জোগাড় হয়েছিল। সে যেদিন এখান থেকে বাড়ী ফিরে গেল, সেই দিনঐ খবর পেয়ে সমস্ত রাত জেগে কিসে প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষা পাবে তারই উপায় খুঁজেছিল; পরদিন সকালবেলাই সে নিজে সেই গ্রামে গেল; সঙ্গে গেছলেন বৌমা। তার পর এই সাইক্লোন···

মোহিনী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—নৌকো ডুবি হয়েটয়েছিল নাকি?

আনন্দবাবু বলিলেন–হীরক যে-রকম সাঁতার জানে, নৌকোডুবি হলেও হয়ত বাঁচত, বৌমাকেও বাঁচাতে পারত···

মোহিনী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—তবে কি তারা দুজনেই বেঁচে নেই?

সেবার মুখ ব্যথিত ঔৎসুক্যে ব্যগ্র হইয়া তার দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটাইয়া তুলিল।

আনন্দবাবু কাতরস্বরে বলিলেন—বৌমা মারা গেছেন; হীরকের অবস্থাও খুব খারাপ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে অছে।

মোহিনী চোখের বিগলিত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে বলিলেন—এমন সর্বনাশ কেমন করে হল?

আনন্দবাবুও চোখ মুছিয়া বলিলেন—সাইক্লোনে বাড়ী চাপা পোড়ে। এই ঝড়ে নবগ্রামের সর্বনাশ কোরে গেছে। হীরকের নিজের দেহে ত আঘাত লেগেছেই, তার বেশী চোট লেগেছে তার মনে—স্ত্রীর এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুতে। ছেলের এই দশা

আর বৌমার মরা শুনে মাও শয্যা নিয়েছেন, তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠবেন না, এক মাসও আর বাঁচবেন কি না সন্দেহ। মা মারা গেলে হীরককেও আর বাঁচানো যাবে না। হীরক যে মা আর স্ত্রী দুজনকেই গভীর ভাবে ভালোবাসত—দুটো শোক সে কিছুতেই সামলাতে পারবে না।

শাশুড়ী বৌ, মা ছেলে, স্বামী স্ত্রী—এই তিন জনের মধ্যে পরস্পরের স্নেহ ভালোবাসার মধুর সম্পর্কের পরিচয় পাইয়া সেবার মন মুগ্ধ হইয়া উঠিল, সে এই অচেনা পরিবারের দুঃখের সমবেদনায় ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

আনন্দবাবু চোখ মুছিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—মার এখন ভাবনা হয়েছে, তিনি মারা গেলে কে হীরককে দেখবে, যত্ন করবে। এই চিন্তাতেই তাঁর মৃত্যু আরো ঘনিয়ে আসছে।

সেবা চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল—ওঁদের কি আপনার লোক কেউ নেই? ওঁরা ত বড়লোক, নার্স রেখে দিলেও ত যত্ন হতে পারে।

আনন্দবাবু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—বড়লোকের আপনার লোকের অভাব হয় না; কিন্তু যেখানে প্রাণের টান নেই, কেবল টাকার টান, সেখানে কি যত্ন সেবা ঠিক হবে আশা করা যায়?

মোহিনী বলিলেন—তাতে আবার গিন্নি নিজে পোড়ে, তিনি যদি মারাই যান! বাড়ীর যে মালিক, সেই রোগী। যারা যত্ন করবে তাদের চালাবে কে?

সেবা ব্যথার উত্তেজনায় একটু জোরেই বলিয়া ফেলিল—চালাবে তাদের নিজেদের কর্তব্যবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি, আবার কে?

আনন্দবাবু বলিলেন—কর্তব্যপরায়ণ ধর্মভীরু লোক কি সংসারে চাইলেই পাওয়া যাই ভাই?

সেবা বলিয়া ফেলিল—আমি যদি হতাম ত জানতে দিতাম না যে আমি রোগীর আত্মীয় নই।

আনন্দবাবু ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—তবে তুই চ না ভাই। এখানে মেয়ে পড়িয়ে, নার্স হয়ে, কী বা হবে তোমার? তুমি যদি এই কাজ স্বীকার করো তবে সমস্ত নবগ্রামের জমিদারীটাই তোমার হবে—তুমিই হবে সে বাড়ীর কর্ত্রী। তোমার সঙ্গে এই পরামর্শ করতেই ত আমি এসেছি।

সেবা অকস্মাৎ এই অভাবনীয় লাভের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—তাঁদের বাড়ীতে ফুলের বাগান আছে?

আনন্দবাবু ব্যথিত হাসির রেখাটুকুকে ঠোঁটের কোণে চাপিয়া বলিলেন—বাগানের ভেতরই বাড়ী তাঁদের। অনেক ফুলের বাগান আছে, আর তুমি ইচ্ছে করলে আরো অনেক ফুলের বাগান তৈরি করাতে পারবে।

সেবা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিল—তাঁদের টাকা আমার সখের জন্যে কেন খরচ করতে যাব আমি?

আনন্দবাবু বলিলেন—তাঁরা তোমায় বাসের জন্যে বাড়ী দেবেন, বাগান দেবেন, যাবজ্জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় চলে এমন টাকা দেবেন, তুমি বিয়ে থা কোরে সংসারী হবে, কেবল তার বদলে শয্যাগত রোগী যে কদিন বেঁচে থাকবে তার দুঃখ প্রাণের মমতা দিয়ে লাঘব করবার চেষ্টা করবে। এই তাঁরা প্রতিদান চান।

সেবা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—নিয়ে চলুন আমাকে দাদা-মশায়। অসাধ্য না হলে আমি তাঁকে সেবা কোরে সুস্থ করে তুলব।

আনন্দবাবু খুসী হইয়া বলিলেন—তবে ভাই, তোমার বাক্স গুছিয়ে নাওগে, আজ রাত্তির আটটার গাড়ীতে যাই চলো। আমি একটা টেলিগ্রাম কোরে দিয়ে আসি।

আনন্দবাবু খুসী হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোহিনী সেবাকে বলিলেন—তবে আর দেরী কোরো না ভাই, কি নেবে থোবে দেখে শুনে নাওগে।

সেবা আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সেবাকে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াই রেণু ও অনু দৌড়িয়া আসিয়া সেবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমাদের ফুল দেবে, গল্প বলবে চলো।

সেবা নুইয়া তাদের গালে হাতের তালি দিয়া আদর করিয়া বলিল—ফুল তোমরা নিজেরা পেড়ে নাও গে ভাই। আর দিদিমার কাছে গল্প শুনো, আমি এখন এক জায়গায় যাচ্ছি।

অনু ও রেণু আশ্চর্য অবাক হইয়া গেল—এ কী কাণ্ড! বিবি-দিদির গাছে হাত দিবার হুকুম কারো ছিল না; আজ একেবারে ঢালা হুকুম ফুল তুলিবার! শিশুমনের বিস্ময় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না; তখনি আনন্দে তাদের সমস্ত মন ছাইয়া গেল, তারা নাচিতে নাচিতে ফুলো ফুলো চুলগুলি দুলাইয়া নাচাইয়া ফুল তুলিতে ছুটিয়া গেল।

সেবা নিজের ঘরে গিয়া জিনিস গুছাইয়া লইবে বলিয়া বাক্সর সামনে দাঁড়াইল। ক্ষণিকের উত্তেজনা সরিয়া যাওয়াতে এখন তার মনে নানান চিন্তা আসিয়া জড়ো হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেবা বাক্সর সামনে বসিয়া পড়িয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে আনন্দবাবু সেবার ঘরে আসিয়া সেবাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাক্স গোছানো হয়ে গেল ভাই? তবে এইবার খেয়ে নাওগে।

সেবা চিন্তাকুল মুখ আনন্দবাবুর দিকে ফিরাইয়া বলিল—আমি যাব না দাদামশায়।

আনন্দবাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—সে কি! কেন?

সেবা বলিল—তাঁদের বাড়ীর যেরকম অবস্থা আপনি বললেন, তাতে আমি গেলে আমারই হাতে সমস্ত কিছুর ভার এসে পড়বে। লোকে ভাববে আমি টাকার লোভে এই কাজ স্বীকার করেছি।

আনন্দবাবু বলিলেন—নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের পরিচর্যা করবার

মতন পরিচয় ত তাঁদের সঙ্গে তোমার নেই। পরের কাজ তুমি যা করবে তার মূল্য তোমার না নিলে চলবে কেন? তুমি ত নার্সের কাজ করবে বোলেই এতদিন নিজেকে প্রস্তুত করেছিলে। এখন সেই কাজই জুটছে। এ সুযোগ ছাড়া কি তোমার উচিত হবে?

সেবা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আনন্দবাবু সেবাকে নির্বাক দেখিয়া বলিলেন—আর আপত্তি কিছু কোরো না ভাই। আমি তাঁদের টেলিগ্রাম কোরে দিয়েছি। তাঁদের একজন দরদী সেবিকার নিতান্তই দরকার। তুমি চলো, গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিয়ো যে তোমার নামই সেবা। তুমি কেবল বেতন নিয়েই কাজ করোনা, তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অমূল্য, টাকা দিয়ে যা পাওয়া যায় না।

আনন্দবাবু ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন—উঠে পড়ো ভাই। আর বেশী সময় নেই।

নীচের রান্নাঘর হইতে মোহিনী ডাকিলেন—বিবি, তোমার দাদা মশায়কে ডেকে নিয়ে নেমে এস, খাবার দেওয়া হয়েছে।

সেবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনন্দবাবুকে বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

আনন্দবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেবা তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া ঝুপ-ঝাপ করিয়া জামাকাপড় কতকগুলা টানিয়া ফেলিয়া দেখিয়া লইল কি আছে, না আছে; তারপর আবার তাড়াতাড়ি সেগুলাকে বাক্সর মধ্যে এলোমেলো অবস্থাতেই ভরিয়া ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

॥ ৭ ॥

সেবা নবগ্রামে পৌঁছিয়া হীরকের বাড়ীর হাতায় ঢুকিয়াই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুন্দর ছবির মতন বাড়ীখানিকে কোলে করিয়া আছে

একটি বিস্তীর্ণ সাজানো বাগান, সেবাদের গাড়ী বাগানের লাল-সুর্কি-ঢালা পথে প্রবেশ করিতেই ফুলের হাসি দিয়া বাগান যেন তাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। এই পুষ্পভূয়িষ্ঠ বাগান এখন হইতে উপভোগ করিবে একা সেই, এই সম্ভাবনার আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ী ঢুকিয়াও সেবার খুব ভালো লাগিতে লাগিল। সমস্ত বাড়ীর মেঝে সাদা মার্বেল-পাথর দিয়া ছাওয়া; সেই মেঝে আবার মাজা ঘসা, আয়নার মতন ঝক্‌ঝকে। বাড়ীর কোথাও এলোমেলো হইয়া কিছু পড়িয়া নাই, কুশ্রী হইয়া কিছু চোখে বাজে না, কোথাও চেঁচামেচি গোলমাল নাই, চাকর দাসীরা নীরবে নিঃশব্দে কাজ করিয়া ফিরিতেছে। এতে সেবার মনে হইল—এ বাড়ীর যিনি গিন্নি আর যিনি মালিক তাঁরা নিশ্চয়ই এমন শৃঙ্খলা-প্রিয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে তাঁদের শয্যাগত হইয়া থাকার সময়েও নিয়মিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম এখনো হইতে পারে নাই; এবং বাড়ীর চাকর দাসীরাও তাদের মুনিবদের এমন ভালোবাসে যে তারাও তাঁদের অসুখে শোকাচ্ছন্ন হইয়া আছে, তারা তাঁদের প্রবর্তিত নিয়মশৃঙ্খলা এখনো লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। যে বাড়ীর চাকর-দাসীরা এমন সায়েস্তা, নিয়মানুগত, সে বাড়ীর মালিকেরা হয় খুব কড়া লোক, নয়ত খুব স্নেহপ্রবণ; যাতে অপর লোককেও তাঁরা নিজেদের ইচ্ছার অনুসারে অনায়াসে হুকুমে চালনা না করিয়াও চালাইতে পারিতেছেন।

লোকনাথ আসিয়া সেবার জিনিষপত্র নামাইয়া সেবার নির্দিষ্ট ঘরে লইয়া গিয়া রাখিতে লাগিল। একজন ঝি আসিয়া সেবাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—আপনি ওপরে আসুন।

সেবা মারবেল পাথরের সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া যেমন যেমন উপরে উঠিতেছিল তার বুকের ভিতরও তেমনি তেমনি উতলা হৃদয় ধকধক করিয়া উঠিতেছিল। সে প্রতি পদক্ষেপে এই বাড়ীর

বুকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে! তাঁরা তাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন, সে তাঁদের খুসী করিয়া তুলিতে পারিবে কি না, এই বাড়ীতে তার থাকিবার মেয়াদ কতদিন—এই সব ভাবনায় সেবার মন তোলপাড় করিতেছিল। আনন্দবাবু বলিয়াছিলেন—সে এখানে বিবাহ করিয়া নিজের গৃহস্থালী পাতিয়া বসিতে পারিবে। সেবা মন হাতড়াইয়া দেখিল তার হৃদয়সিংহাসন একেবারে খালি—গৃহস্থালীর রাজ্যে অভিষেক করিবার মতন একটি মুখও তার মনে উঁকি মারিল না। দারিদ্র ও নিরাশ্রয়তার সঙ্গে লড়াই করিতেই তার মন এতদিন ব্যাপৃত ছিল; তার উপর ছিল তার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের সকল ফাঁক আচ্ছন্ন করিয়া, সকল প্রবেশদ্বার আগলাইয়া বসিয়া; তাই এতদিন কোনো তরুণের মুখের ছবি সেবার রুদ্ধ মনে ছাপ রাখিবার অবসরই পায় নাই।

আজ দারিদ্র দুঃখ ঘুচিবার সম্ভাবনার সূত্রপাতে তার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা বাগান পাওয়ার সখ যখন মিটিবার আশা তার মনের কোণে বাসা বাঁধিতেছিল, তখন তার মনের যৌবন অকস্মাৎ নিজের নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়তায় ও প্রণয়ের দারিদ্রে ব্যথিত হইয়া উঠিল; রূপকথার শূন্য সিংহাসন পূরণ করিবার জন্য রাজহস্তী যেমন যোগ্য পাত্রের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ধাবিত হইয়াছিল, তার মনও তেমনি দেশ-দেশান্তরে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল, তার চেনা কোনো লোককে তার যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা হয় কি না দেখিয়া যাচাই করিয়া লইবার জন্য! কোথাও তার মন আগ্রহ অনুভব না করিয়া বারবার বিমুখ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া অপরের সন্ধানে ছুটিতেছিল।

তার চিন্তায় বাধা দিয়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল—আগে চান করবেন, না আগে মার সঙ্গে দেখা করবেন?

সেবা থমকিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা কোন ঘরে আছেন? বাবু কোন ঘরে আছেন?

ঝি আঙ্গুল দিয়া ঘর দেখাইয়া বলিল—ঐ ঘরে আছেন মা, আর এই পাশের ঘরে আছেন বাবু।

সেবা ঘরের দেয়াল-জোড়া বড় আয়নার দিকে একবার চট করিয়া ফিরিয়া আপনার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে জাগিয়া আসিয়া মুখ চোখ শুকাইয়া বসিয়া গিয়াছে, চুল উস্কোখুস্কো ও কাপড় জামা মলিন লাট হইয়া গিয়াছে। এই বেশে নূতন লোকের সামনে বাহির হইতে সেবার লজ্জা বোধ হইল। সে বলিল—আমায় চানের ঘর দেখিয়ে দাও, আমি চট কোরে চান কোরে নিয়ে মার সঙ্গে দেখা করব।

স্নানান্তে দীর্ঘ ভিজা চুল আঁচড়াইয়া পিঠে ছড়াইয়া ধোয়া কাপড় জামা পরিয়া সেবা যখন ঝির পিছনে পিছনে গিয়া সুমতির ঘরে ঢুকিল, তখন লোক আসার শব্দ পাইয়া সুমতি দরজার দিকে তাকাইয়া মৃদু-স্বরে ডাকিলেন—এস মা, এস।

সেবা অগ্রসর হইয়া গিয়া শয্যাগতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সুমতি সেবার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাত্রের গাড়ীতে আসতে কোনো কষ্ট হয়নি ত ?

সেবা ঘাড় নাড়িয়া কোমলস্বরে বলিল—না।

সুমতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি নাকি বড় ভালো মেয়ে ?

এই প্রশ্ন শুনিয়া সেবার মুখে ঈষৎ একটু হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল, লজ্জায় ও কৌতুকে তার মুখ দীপ্তিতে ঝলমল করিতে লাগিল; সে কোনো উত্তর না দিয়া বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি নত করিয়া রহিল।

এমন ধীমণ্ডিত শ্রী সুমতি আর কোনো মেয়ের এর আগে দেখেন নাই। তাঁর মন মুগ্ধ হইয়া গেল। রমার কথা তাঁর মনে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রমার সঙ্গে সেবার তুলনাও তাঁর মনের

উপর দিয়া বহিয়া গেল। রমার মতন এ সুন্দরী নিশ্চয়ই নয়; রমা ছিল সাদা গোলাপ আর এ অপরাজিতা; রমা ছিল আকাশে উষার উন্মেষ, আর এ যেন সন্ধ্যার শ্যামলা বসুমতী; এও সুন্দর, এও নয়নকে মুগ্ধ করে, এও মনকে তৃপ্ত করে। সুমতির মনে হইল একে দেখিলে হীরকের নিশ্চয় মনে ধরিবে। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—তুমি আমার কাছে এস।

সেবা তাঁর কাছে সরিয়া গেলে তিনি সেবার হাত ধরিয়া একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—বড় দুঃসময়ে তোমায় এনেছি মা। আমি কোথায় তোমার যত্ন করব, না তোমাকে এনেছি আমাদের যত্ন করতে। এই বাড়ী ঘর চাকর দাসী সব তোমার, তুমি কিছু কুণ্ঠা কোনো সঙ্কোচ কোরো না মা, আমি মা-ছোড় হয়েছি, তুমিই এখন আমার মা।

রমাকে মনে করিয়া সুমতির চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সুমতির স্নেহে আর্দ্র ও আকৃষ্ট হইয়া সেবা সজল চোখে নিজের আঁচল দিয়া সুমতির চোখ মুছাইয়া দিয়া মৃদু কোমল স্বরে বলিল—আমিও মা মা-ছোড় ছেলেবেলা থেকে; আমিই বরং মা পেয়ে গেলাম···

সুমতি সেবাকে তার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—একি আর পাওয়া মা? আমার ত শেষ হয়ে এসেছে। যে ছেলেটাকে মা-ছোড় অসহায় কোরে ফেলে যাব, তাকেই তোমায় দেখতে হবে, তার সমস্ত ভার তোমায় নিতে হবে।

এই কথায় সেবার মনে পড়িল হীরককে। তাকে দেখিবার জন্য তার মন উৎসুক হইয়া উঠিল, সে হীরকের ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহা দেখিয়া সুমতি বলিলেন—ঐ ঘরেই সে অক্ষম হয়ে পড়ে রয়েছে; রাত দিন নাকি তার চোখের জল শুকোচ্ছে না। যত্ন কোরে, মমতা দিয়ে, ভালবেসে, তুমি তাকে ভালো কোরে তুলতে কি পারবে মা?

সেবা সেই অদেখা লোকটির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা কোরে দেখব।

সুমতি রোদন করিতে করিতে বলিলেন—তাই দেখো মা। ঐ ঘরে সে আছে—যাও তুমি। আমার সাধ্য নেই যে তোমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব; তুমি লজ্জা কোরো না, তুমি হীরুর কাছে যাও। কামিনী, মাকে আমার সঙ্গে কোরে ঐ ঘরে দিয়ে আয়।

সেবা ব্যগ্রতায় উৎসুক অথচ সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া আস্তে আস্তে গিয়া হীরকের ঘরে ঢুকিল। সেবা ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া গিয়া দাঁড়াইতেই হীরক চোখ ফিরাইয়া তাকে দেখিল এবং ছুজন অপরিচিত যুবক-যুবতীর প্রথম সাক্ষাতে তাদের ছুজনেরই দৃষ্টি বিস্ময়ে পুলকে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সেবা মনে করিয়াছিল সে আসিয়া দেখিবে বড়লোকের ননীগোপাল রোগের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে, রোগশয্যায় শীর্ণ হতশ্রী হইয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু সে আসিয়া দেখিল, যে-লোক বিছানায় পড়িয়া আছে সে যে রোগী তার কোনো চিহ্ন তার মুখে নাই: তার মুখখানি শিশুর মতন সরল ও সুন্দর, অথচ তাতে পৌরুষের দৃঢ়তার ছাপ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে; তার বড় বড় রুক্ষ চুলগুলি ফুলিয়া উঠিয়া বহুকালের সিঁথি কাটার অভ্যাসে আপনিই মাথার ছুপাশে বিভক্ত বিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; এই যুবাকে দেখিতে বাস্তবিক সুন্দর। সুন্দর বস্তু দর্শনের আনন্দ ও অপ্রত্যাশিত বস্তু দর্শনের বিস্ময় সেবার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর হীরক ত জানিত না যে তাদের বাড়ীতে কোনো নূতন লোককে আনিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাই অকস্মাৎ এই নিতান্ত অপরিচিতাকে তার ঘরে আসিতে দেখিয়া তারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না; সেবার রঙ ফর্সা নয়, তার মুখশ্রী নিখুঁত নয়, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি শ্রী হীরকের চোখ দেখিতে পাইল যাহা সচরাচর সাধারণ মেয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; সেবার কাপড় পরিবার বিশেষ

একটি শোভন ধরণ, কান দুটি ঢাকিয়া চুল আঁচড়াইবার বিশেষ একটি ভঙ্গী, তার মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, তার বড় বড় চোখ দুটিতে মদির দৃষ্টি, তার পাতলা ঠোঁটের দুটি কোণে বিশেষ রকম একটু রেখার টান, তার দুটি গালের দুটি টোলে অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে লজ্জার লাবণ্যের টলটলানি, তার চোখে মুখে বিস্মিত আনন্দের আভা—সমস্ত গিয়া হীরককে মুগ্ধ চমৎকৃত করিল। হীরকের মনে হইল এই মেয়েটির চুল আঁচড়াইবার ভঙ্গীতে বিখ্যাত উপন্যাস-লেখিকা জর্জ ইলিয়ট কিম্বা সার্লৎ ব্রন্টের—কি জানি কার যেন আদল আসিতেছে; তার ঠোঁটের তরঙ্গিত রেখার টান যেন চিত্রকরা পঞ্চশরের ফুলধনু, যেন এক জোড়া ব্রেস ব্র্যাকেট—তার মধুমাখা কথা আর মন-আলোকরা হাসির বন্ধনী হইয়া আছে; তার সর্বাঙ্গের সুষমা যেন পুষ্পপ্রচুর নববসন্তের কিশলয়ের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সৌন্দর্যে মাধুর্যে দৃষ্টিলোভন। দুজনে দুজনকে দেখিয়া দুজনেরই যে আনন্দ ও বিস্ময় মনের গোপনপুরে উদয় হইয়াছিল তাহা তাদের দুজনেরই মুখে ফুটিয়া ওঠাতে একের চোখে অপরকে আরো সুন্দর আরো মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

বিস্ময়ের প্রথম স্তম্ভিত মুহূর্ত অতিক্রম করিয়া হীরক প্রথমে কথা কহিল—আমি পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট অনড় হয়ে পড়ে আছি, আমি যে উঠে আপনার অভ্যর্থনা করব এমন সামর্থ আমার নেই; আমার অভদ্রতা ক্ষমা করবেন।

হীরক প্রথমে কথা কওয়াতে সেবার সঙ্কোচ অতিক্রম করা সহজ হইল, সে মৃদু কোমলকণ্ঠে বলিল—আপনি সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না। আপনার অসুখ জেনেই আমি দেখতে এসেছি।

হীরক যতক্ষণ সেবার সঙ্গে কথা বলিতেছিল ও তার উত্তর শুনিতেছিল, ততক্ষণ কেবল ভাবিতেছিল এই মেয়েটি কে, এ কে হইতে পারে, কার আসার সম্ভাবনা। হীরক সম্ভাবনার সমস্ত রাজ্য তল্লাস করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি সেবা?

সেবা লজ্জিত হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া বলিল—হ্যাঁ।

হীরকের মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে ব্যথিত স্বরে বলিল—আপনি এমন দুঃসময়ে এলেন যে আপনাকে দেখবার শোনবার লোক এ-বাড়ীতে কেউ নেই। মা আর আমি বিছানায় পোড়ে; আর-একজন যে ছিল সে আমাদের ফেলে আগেই চলে গেছে।

রমাকে মনে হইতেই হীরকের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; একজন অপরিচিতা-সদ্য-আগতা মেয়ের সামনে নিজের শোক গোপন রাখিবার চেষ্টা সত্বেও হীরক চোখের জল নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

সেবা তাড়াতাড়ি একেবারে হীরকের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পত্নীশোকাতুর অপরিচিত যুবাকে সে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ঘরের এদিক ওদিক তাকাইতেই সেবা দেখিল হীরকের খাটের মাথার দিকে একটা তেপায়া টেবিলের উপর একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ রহিয়াছে, ডাকে আসিয়াছে, এখনো তার মোড়ক খোলা হয় নাই। পূর্ব-কার ব্যবস্থা অনুযায়ী লোকনাথ ডাকের কাগজপত্র আনিয়া প্রত্যহ হীরকের কাছে রাখে, সেগুলা অবহেলায় পড়িয়াই থাকে, হীরকের নিজের হাতে তুলিয়া পড়িবার সাধ্যও নাই, এমন কেউ নাইও যে তাকে পড়িয়া শোনায়; সেই সব চিঠিপত্র কাগজ একদিনের বাসি হইলে সেগুলি সরাইয়া লোকনাথ আবার টাটকা ডাক রাখিয়া যায়। সেবা খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইয়া হীরককে অন্যমনস্ক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে খবরের কাগজ পোড়ে শোনাব কি?

হীরক হতাশাভরা স্বরে বলিল—আর খবর! বিশ্ব-সংসার থেকে আমি ত একেবারে নির্বাসিত হয়ে গেছি। আপনি পড়বেন ত পড়ুন—আচ্ছা চেঁচিয়েই পড়ুন।

সেবা খবরের কাগজ খুলিয়া তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিষয়ের মোটা

মোটা হেডিংগুলা পড়িতে লাগিল এবং যে খবরটা হীরকের শুনিবার আগ্রহ হইতে পারে মনে হইতেছিল অথবা যে হেড-লাইনটা পড়িবামাত্রই হীরকের দৃষ্টি উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, সেবা সেই খবরগুলিই পড়িয়া পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ হীরক জিজ্ঞাসা করিল—আজকে বাংলা কোন্ তারিখ বলতে পারেন?

সেবা একটু মনে করিয়া বলিল—আজকে তেসরা।

হীরক ব্যগ্র হইয়া বলিল—তাহলে দেখুন ত, ডাকের কাগজ পত্রের মধ্যে, প্রবাসী এসেছে কি না?

সেবা ডাকের কাগজের ভিতর হইতে বাছিয়া প্রবাসী বাহির করিয়া মোড়ক খুলিতে খুলিতে বলিল—এসেছে।

হীরক ব্যগ্র হইয়া বলিল—একবার স্থচীটা দয়া করে পড়বেন কি?

সেবা স্থচীর বিষয়নামগুলি একে একে পড়িতে লাগিল।

দুর্ঘটনা ঘটার পর প্রথম এই আজ হীরক কোনো বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল অথবা মনোযোগ দিল। আর পাশের ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া লোকনাথ ইহা দেখিতেছিল; অনেকদিন পরে তারও মুখ আজ হাসিহাসি হইয়া উঠিয়াছিল। খোকাবাবুকে দুধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে, সে দুধ গরম করিয়া আনিয়া গেলাস হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সে এখন গিয়া তার খোকাবাবুর নবোদ্‌গত উৎসাহে বাধা দিতে চাহিতেছিল না।

সেবা একটার পর একটা বিষয় হীরকের ফরমাস-মত পড়িয়া পড়িয়া শোনাইতেছে। হীরক আর কখনো এমন কোনো মেয়ের সঙ্গ পায় নাই, যে বন্ধুর মতন অন্তরের সকল আকাঙ্ক্ষা এমন করিয়া পূরণ করিতে পারে; মেয়ে-মানুষ যে হাঁড়িকুঁড়ি ডাঁটা-চচ্চড়ি বড় জোর পরনিন্দা পরকুৎসা ছাড়া বিশ্বের উচ্চ চিন্তাধারার সঙ্গে অপরের যোগসাধন করিয়া দিতে পারে, ইহা হীরকের অভিজ্ঞতার অতীত ছিল; আজ তার এই নূতন অভিজ্ঞতার বিস্মিত আনন্দ তার

দৃষ্টিতে তার মুখের দীপ্তিতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল ; হীরকের আর হুঁশ ছিল না যে তার এখনো খাওয়া হয় নাই ; এই নবাগতা অপরিচিতারও এখনো খাওয়া হয় নাই। সে এই কদিন বিশ্ব-সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আপনার শোকের মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়াছিল ; আজ অকস্মাৎ এ কোন্ দেববালা আবির্ভূত হইয়া অবলীলাক্রমে তাকে দুঃখকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্বের আনন্দ-যাত্রার সঙ্গে জুড়িয়া দিল !

হঠাৎ হীরকের কানে ঘড়ী বাজার টং টং শব্দ গেল ; সে চোখ ঘুরাইয়া ঘড়ীর দিকে দেখিল এগারোটা বাজিল। হীরক একটু লজ্জিত ও একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—উঃ অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনাকে অনেক বকিয়েছি। আমি টেরই পাই নি যে এত বেলা হয়ে গেছে। আপনার এখনো কিছু খাওয়া হয়নি। আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ বাড়ীর লোকগুলো সব গেল কোথায় ? আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে সকলকেই পক্ষাঘাতে ধরল নাকি ? এই অভিশপ্ত বাড়ীতে এমন দুঃসময়ে কষ্ট পেতে আপনি কেন এলেন ?

সেবা কি বলিতে যাইতেছিল, হীরক তাহা বলিতে দিবার ও শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই কপাল ও ভ্রূ কুঁচকাইয়া বিরক্তিতীব্র স্বরে চীৎকার করিল—লোকাদা ! এই, কে আছিস এ তল্লাটে ! সব মরেছিস নাকি ?

সেবা হীরকের চীৎকারে ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ডেকে আনছি কাউকে।

লোকনাথ পাশের ঘরেই থার্মসফ্লাস্কে গরম দুধ লইয়া বসিয়া আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছিল ; হীরকের ডাক শুনিবামাত্রই সে তাড়াতাড়ি দুধটা রূপার গেলাসে ঢালিয়া রূপার রেকাবির উপর বসাইয়া লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। হীরক লোকনাথকে দেখিয়াই আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—আজ এতক্ষণ কোথায় মোরে ছিলি সব ?

লোকনাথ ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। সেবা তাড়াতাড়ি কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—সকাল থেকে আপনার কিছু খাওয়া হয় নি আমি জানতাম না। আমি আছি বলেই এরা কেউ এতক্ষণ আসে নি। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে! কাল থেকে আর কোনো অনিয়ম আমি হোতে দেব না।

সেবার সামনে ক্রোধ প্রকাশ করাতে এবং তাতে সেবা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া হীরক শান্ত ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সেবা যে বলিল কাল হইতে আর অনিয়ম হইতে সে দিবে না, এর মানে কি কাল সে চলিয়া যাইবে, অথবা কাল থেকে সে তার কাছে আসিবে না? হীরক যে বারবার সেবাকে বলিল—কেন আপনি এমন দুঃসময়ে এলেন,—তাতে কি সেবা তার উদ্দেশ্য ভুল বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাই কি সে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে? হীরকের মুখ নিজের অসহিষ্ণু আচরণে অসন্তুষ্ট ও অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল, সে চুপ করিয়া রহিল।

সেবা লোকনাথের হাত হইতে দুধের গেলাস লইয়া হীরকের মুখের কাছে নত হইয়া বলিল—আপনি দুধটুকু খেয়ে নিন। গেলাসে কি করে খাবেন?

লোকনাথ বলিল—গলায় হাত দিয়ে একটু তুলে ধরতে হবে।

সেবা লোকনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ফিডিংকাপ - গাড়ুর মতন নল দেওয়া বাটি—নেই?

হীরক বলিল—ছিল সবই: আছেও বোধ হয়। কিন্তু দেখে-শুনে খুঁজে-পেতে করবার লোকেরই অভাব হয়েছে। আর কটা দিনই বা, এমনি কোরেই কেটে যাবে।

হীরকের কথায় বিষণ্ণ হতাশার যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা গিয়া সেবার অন্তরেও বাজিল। সেবা দুঃখিত স্বরে সান্ত্বনা ভরিয়া বলিল—আপনি অমন হতাশ হচ্ছেন কেন?···

হীরক ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আর আশাই বা করব কিসের?

সেবা বলিল—অসুখ মানুষের হয়েই থাকে; আবার ভালো হোয়ে উঠবেন…

হীরক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ছলছল চোখে সেবার দিকে চাহিয়া উদাস স্বরে বলিল—আর ভালো! সব ভালো আমার শেষ হয়ে গেছে।

হীরকের শোক আবার মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সেবা তাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল—দুধটুকু জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলুন।

সেবা হীরকের মুখের কাছে নত হইয়া হীরকের গলায় একখানি ধোয়া তোয়ালে পাতিয়া দিল, তারপর বাঁহাতখানি হীরকের গলার তলে দিয়া তাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং আস্তে আস্তে হীরকের মাথাটি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ডান হাতে দুধের গ্লাস তার মুখের কাছে ধরিল। সেবা হাসপাতালে সেবিকার কাজ করিতে গিয়া কত রোগীকে ত এমনি করিয়া তুলিয়াছে; কখনো তার মনে একটু সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ হয় নাই; কিন্তু আজ তার মনে হইল সে একজন তরুণ সুন্দর পুরুষের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে; সেবার মুখ লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হইয়া উঠিল। হীরকও অনুভব করিতেছিল এই তরুণীর বাহুবেষ্টনের কোমল মদির স্পর্শ, তার গালের উপর লজ্জিতার ঘন দ্রুত নিশ্বাস, তার কপালে আনতার মাথার একটি স্খলিত অলকগুচ্ছের আলগোছ মৃদু স্ফুরণ। আজ তার দুধ খাওয়ার মধ্যে ক্ষুধাশান্তি ছাড়াও একটু বেশী তৃপ্তি যেন সে পাইল। দুধ খাওয়া হইলে সেবা আবার আস্তে আস্তে হীরকের মাথা নামাইয়া বালিশের উপর রাখিয়া দিল, এবং একটু ফর্শা নেকড়া ভিজাইয়া হীরকের মুখ ধুইয়া দিয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিয়া দিল। হীরকের মনে হইল রমা থাকিলে সেও তাকে এমনি করিয়াই যত্ন করিত। তার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল, সে একটুকু নিরিবিলি কাঁদিয়া লইবার জন্য আর্দ্রস্বরে বলিল—আপনি এখন খেয়ে-টেয়ে বিশ্রাম করুন গে। লোকদা, এঁকে নিয়ে যা,—কামিনীকে বল্‌গে এঁকে দেখুক শুনুক,—তোরা সব কি হয়েছিস বল্ ত?

হীরকের কথায় যেন কান্নার সুর বাজিয়া উঠিল। সেবা তাড়াতাড়ি বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে, আমি নিজেই সব দেখে শুনে নেব।

হীরক বলিল—হ্যাঁ, তাই নেবেন দয়া কোরে, আমাদের অবস্থা ত দেখছেন? লোকদা, নিয়ে যা এঁকে।

লোকনাথের পিছনে পিছনে সেবা হীরকের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই হীরক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ কান্না যে কেন তা সে ঠিক বুঝতে পারিতেছিল না; রমার অভাব উপলক্ষ্য করিয়া এ কান্না আসিয়াছিল, কিন্তু তার মধ্যে মিশিয়াছিল নিজের জড় অবস্থায় অক্ষমতার লজ্জা ও দুঃখ, নবাগতার যত্নের আতিথ্যের ত্রুটির লজ্জা ও বিরক্তি, আরো হয়ত অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় একটা কিছু।

সেবা বাহিরে আসিয়া লোকনাথকে বলিল—মা আর বাবু কখন্ কি খান, কি করেন, কি ভালবাসেন, কি ভালবাসেন না, সব আমায় বোলে দিও। আমি একবার মাকে দেখে আসি।

সেবার কথাগুলি হীরক শুনিতে পাইল। সেবার যত্নের আগ্রহের পরিচয় যতই হীরক পাইতেছিল ততই তার রমার অভাব মনে হইয়া মন-কেমন করিতেছিল; এখন ঘরে কেউ নাই দেখিয়া হীরক একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া লইতে লাগিল।

সেবা যখন সুমতির ঘরে গিয়া ঢুকিল, তখন সুমতির বিছানার পাশে চেয়ারে বসিয়াছিলেন আনন্দবাবু। আনন্দবাবু সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—সেবাকে দেখলেন ত? কি মনে হল?

সুমতি বলিলেন—খাসা মেয়ে। হীরুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। হীরুরও ভাল লেগেছে বোধ হয়; সেবার বই পড়া স্থির হয়ে ত শুনছে।

আনন্দবাবু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সেবাকে কি বিয়ের কথা বলেছেন?

সুমতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না, এখনো বলিনি, আরো দু-এক দিন যাক।

এমন সময় সেবা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেবাকে দেখিয়াই আনন্দ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যাই একবার হীরককে দেখে আসি।

আনন্দবাবু যাইতে যাইতে সেবাকে আস্তে আস্তে বলিয়া গেলেন—এখানে কিছু লজ্জা-টজ্জা কোরো না ভাই, দেখছ ত বাড়ীর অবস্থা। এই বাড়ী ঘর সংসার চাকর দাসী সব তোমার—তুমি অসঙ্কোচে তোমার যা দরকার নেবে করবে বলবে।

সেবা কেবল একটু হাসিল। আনন্দবাবু বাহির হইয়া গেলেন। সেবা সুমতির কাছে আসিয়া দাঁড়াতেই সুমতি বলিলেন—এস মা এস। এতখানি বেলা হয়ে গেল এখনো কিছু খাওয়া হয় নি। কামিনীকে একবার ডাকো ত মা, তোমাকে খেতে দিক।

সেবা বলিল—আমার জন্যে আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না। আমি খাব এখন। আপনাদের ওষুধ পথ্য খাবার সময় কি হয়েছে?

সুমতি বলিলেন—কি জানি মা। লোকনাথ সব জানে, তাকেই জিজ্ঞাসা করে নিও। পুরনো চাকর, কর্তার আমলের, আমার হীরুকে ওই মানুষ করেছে, হীরু ওকে দাদা বলে, বৌমাও লোকনাথদাদা বল্‌ত।

সেবা সুমতির উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া নম্রস্বরে বলিল—আমিও ওকে লোকনাথদাদা বলেই ডাকব।

কামিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, দিদিমণির জলখাবার আনব? ভাতও হয়ে গেছে।

সুমতি বলিলেন—আমার ঘরেই দুখানা ঠাঁই করে দে—মার আর বড়্‌ঠাকুরের। তুমি বড়্‌ঠাকুরের সামনে খাবে ত মা?

সেবা বলিল—কে দাদামশাই? দাদামশায়ের সামনে আমি খাই।

কামিনী খাবার ঠাঁই করিতে লাগিল। লোকনাথ কয়েক থোলো চাবি আনিয়া সেবার সামনে ধরিয়া বলিল—এই সব চাবি বাক্‌স দেরাজ আলমারীর।

সেবা জিজ্ঞাসু বিস্মিত দৃষ্টিতে সুমতির মুখের দিকে চাহিল। সুমতি বলিলেন—ওই সব চাবি আমার বৌমাই রাখতেন; এখন তুমিই রাখো মা। তুমি সমস্ত দেখে শুনে নিয়ো। আমার হীরুর যেন কোন কিছুর অভাব হয় না, তোমার নিজেরও যেন কোন কষ্ট না হয়, তোমাকেই কোরে কর্মে নিতে হবে।

লোকনাথের চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল; সুমতি তাকে ডাকিয়া বলিলেন—লোকনাথ, বড়্ঠাকুরকে ডেকে দাওগে, ভাত আনছে।

লোকনাথ চলিয়া গেল। সেবা চাবির থোলোগুলি লইয়া নাড়িয়া নাড়িয়া গম্ভীর মুখে ভাবিতেছিল এদের এই যত্নের ও বিশ্বাসের প্রতিদান সে দিতে পারিবে কি?

লোকনাথ গিয়া আনন্দবাবুকে খাবার প্রস্তুতের খবর দিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হীরক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি আজকেই চলে যাবেন জ্যাঠামশায়?

আনন্দবাবু হীরকের কপালে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—না বাবা, তোমাদের এ অবস্থায় ফেলে আমি কোথায় যাব!

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—সেবাও কি এখন থাকবেন কিছুদিন?

আনন্দবাবু বলিলেন—হ্যাঁ সেও থাকবে। তোমার জেঠিমাকেও নিয়ে আসব ভেবেছি।

হীরক উৎফুল্ল মুখে বল্লিল—আপনারা এখানে থাকলে বেশ হয়!

আনন্দবাবু বলিলেন—তাই থাকব বাবা।

হীরক চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তার চোখে মুখে খুসীর আলো ঝলমল করিতে লাগিল।

॥ ৮ ॥

সুমতির ঘরে আনন্দবাবু ও সেবা খাইতে বসিয়াছেন, পাচক ব্রাহ্মণ এঁদের ভাত দিয়া হীরকের ভাত লইয়া তাকে খাওয়াইয়া

দিতে গেল ; সে-ই রোজ হীরককে খাওয়াইয়া দ্যায়। বামুন-ঠাকুর ভাত মাখিয়া হীরককে খাওয়াইয়া দিতে দিতে এক গ্রাসের কয়েকটি ভাত হীরকের গায়ে পড়িয়া গেল। হীরক অমনি ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—তুমি কি কাণা, দেখতে পাও না? গায়ে কত ভাত ফেললে দেখ দেখি, নিয়ে যাও তোমার ভাত, আমি আর খেতে চাইনে। কতদিনে যে তোমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব তা জানিনে।

বামুন বেচারা ভয়ে থতমত খাইয়া মিনতি করিয়া বলিল—আর দুটি খান বাবু, কিছুই যে খাওয়া হল না···

হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—আমি আর খাব না বলছি···

বামুন আবার মিনতি করিয়া বলিল—আমি এবার সাবধান হয়ে খাইয়ে দেবো বাবু।

হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার কথা তুমি শুনবে কি না বলো! আমি খাব না, কিছুতেই খাব না···

সুমতির ঘর হইতে হীরকের চীৎকার শোনা যাইতেছিল। সেবা খাইতে খাইতে হাত গুটাইয়া কান খাড়া করিয়া একবার হীরকের চীৎকার শুনিল, তারপর আনন্দবাবুকে বলিল—দাদামশায়, আপনি অনুমতি করুন, আমি উঠি।

আনন্দবাবু দেখিলেন সেবার পাতে মাখা ভাত পড়িয়া আছে, তা ফেলিয়াই সে উঠিতে চাহিতেছে। এতে তিনি বুঝিলেন যে সেবা হীরককে দেখিতে যাইবার জন্যই নিজের খাওয়া ফেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। সেবার হীরককে যত্ন করিবার আগ্রহ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দবাবু প্রফুল্লমুখে বলিলেন—হ্যাঁ ভাই, তুমি ওঠ।

অনুমতি পাওয়া মাত্র সেবা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আনন্দবাবু প্রফুল্লমুখ ফিরাইয়া সুমতির মুখের দিকে চাহিলেন, সুমতির মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেবা চটপট হাতমুখ ধুইয়া হীরকের ঘরে গিয়া ঢুকিল। তখন বামুন-

ঠাকুর ভাতের থালা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার যোগাড় করিতেছে; এবং লোকনাথ হীরকের গা হইতে ভাত খুঁটিয়া তুলিয়া ধোয়াইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সেবা ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

হীরক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—দেখুন না, গায়ে বিছানায় ঝোল-মাখা ভাত ছড়িয়ে কি কাণ্ড করেছে।

সেবা বলিল—শুয়ে খেতে গেলে একটু ত পড়বেই। বুকের ওপর একটা তোয়ালে ঢাকা দিয়ে নিলে, তাতেই পড়ে, গায়ে বিছানায় লাগে না। লোকনাথ-দাদা একখানা ফরসা শুকনো তোয়ালে এনে দাও, আর একখানা বড় চামচে দাও। নিজের হাতে খাওয়া যায়, কিন্তু পরের হাতে খেতে ঘেন্না করে, হাতে ময়লা-টয়লাও থাকে।

হীরক হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, এইসব আনাড়িতেই ত চামচে কোরে খাওয়াতে পারবে! হাতে কোরেই খাওয়াতে পারে না।

সেবা কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমার ছোঁয়া ত খাবেন না, নইলে আমি খাইয়ে দিতে পারতাম।

হীরক হিন্দুঘরের ছেলে, আবাল্যের সংস্কারের বশেই এখন পর্যন্ত স্বজাতি বলিয়া পরিচিত লোকের ছোঁয়া ছাড়া অপর কোনো জাতির লোকের ছোঁয়া ভাত-তরকারী খায় নাই। এই সংস্কার অতিক্রম করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই বা তেমন কোনো অবস্থাতেও সে এতদিন পড়ে নাই, তাই সে এতদিন এ বিষয়ে কিছু ভাবেও নাই। আজ সেবার কথা শুনিয়া তার মন এ সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিল; একে সেবা মেয়েমানুষ, তায় তরুণী, তায় সদ্যপরিচিতা অভ্যাগত অতিথি, তাকে কোনো আচরণে নিজের চেয়ে হীন ও ছোট বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করিতে হীরকের সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হইল, তার কোমল অন্তর ব্যথা বোধ করিল। তাই বহুদিনের সংস্কার অতিক্রমের চেষ্টা ও অপরের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠতা

গোপনের প্রয়াসে একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনার ছোঁয়া আমি খাব না কে বল্‌লে? আপনি বরং খাইয়ে দিয়ে দেখুন।

সেবা হীরকের এই নিমন্ত্রণে উৎফুল্ল হইয়া চাপা খুসীর হাসিতে উজ্জ্বল মুখে হীরকের মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লোকনাথ ফর্‌সা তোয়ালে ও একটা বড় রূপোর চাম্‌চে আনিয়া হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে সেবার দিকে সেই সব আগাইয়া ধরিল। সেবা শিক্ষিতার নিপুণ হাতে হীরককে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে হীরকের মনে হইতেছিল—রমা কিন্তু এই কাজটি এমন করিয়া করিতে পারিত না।

খাওয়া হইলে সেবা হীরকের মুখ ধোয়াইয়া দিল। হীরক হাসিয়া বলিল—আজ আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম। আপনি এখন খেয়ে একটু বিশ্রাম করুনগে। আমি আর চেঁচিয়ে আপনার বিশ্রামের বিঘ্ন করব না।

সেবা নীরব হাসিতে হীরকের ভদ্রতায় সন্তোষ জানাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেবা যখন আবার সুমতির ঘরে গিয়া ঢুকিল তখন তার মুখে মনের খুশীর আভা আসিয়া পড়িয়াছে, সে যে আজ একদিনেই হীরকের কিছু অসুবিধাও দূর করিয়া তাকে কিছুও প্রীত করিতে পারিয়াছে এই কৃতকার্যতার কৃতার্থতা তার মনকে আনন্দ-দোলায় দোল দিতেছিল, এবং তার মুখে তারই আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সেবাকে উজ্জ্বল মুখে ঘরে আসিতে দেখিয়াই সুমতিরও মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেবা ঘরে ঢুকিতেই তিনি হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন—এস মা, একবার আমার কাছে এস।

সেবা বুঝিতে পারিল—ছেলের আরামে মার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে; যে তাঁর ছেলেকে একটু সুখী করিতে পারিয়াছে, তাকে তিনি অন্তরের আনন্দ জানাইতে চাহিতেছেন। পাছে তিনি কিছু বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া সেবা

সুমতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুমতি তার হাত স্নেহভরে ধরিয়া শুধু বলিলেন—তুমি একবার আমার কোলের কাছে বোসো।

সেবা কুণ্ঠিত হাসিমুখে সুমতির বিছানায় বসিল। সুমতি ডাকিলেন—কামিনী, বামুন-ঠাকুর ভাত আনছে কি না দেখ্।

সুমতি যে সেবার হীরককে যত্ন করার কথা কিছু বলিলেন না, এতে সেবা আরাম বোধ করিল। সে এবার সলজ্জভাবে বলিল—আবার ভাত কেন মা। আমি ঐ ভাতই খেতাম।

সুমতি সেবার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন—না মা, ও উচ্ছিষ্ট ভাত কি খায়? অনেকক্ষণ থালা পড়ে রয়েছে।

সেবা সুমতির স্নেহের স্পর্শে অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিল। কামিনী ঘরের এঁটো পরিষ্কার করিতে লাগিল।

সেবার খাওয়া হইলে সুমতি বলিলেন—যাও মা, এখন একটু গড়াওগে।

সেবা সুমতির ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু শুইয়া বিশ্রাম করিতে নয়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে যত আল্‌মারী দেরাজ বাক্‌স তোরঙ্গ ছিল, সেবা লোকনাথ ও কামিনীকে সঙ্গে লইয়া চাবি চিনিয়া চিনিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল, কার মধ্যে কি কি জিনিস আছে; সেইসব জিনিস দেখিতে দেখিতে যেগুলি পীড়িতদের কাজে লাগিবে বলিয়া সেবার মনে হইতেছিল, সেই-গুলি সে বাহির করিয়া রাখিতে লাগিল।

সমস্ত দেখা হইয়া গেলে সেবা লোকনাথ ও কামিনীকে বলিল—তোমরা এখন খেতে যাও। মা আর বাবুকে আমি দেখব।

লোকনাথ ও কামিনী চলিয়া গেল। সেবা আস্তে আস্তে বাগানে নামিয়া গেল। বাগানে পা দিয়াই সেবার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—এই বাগান এখন উপভোগ করিবে একা সে! সেবা ডালপালা-সুদ্ধ ফুল তুলিতে তুলিতে একবার সমস্ত বাগান বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিল যখন, তখন তার দুই হাত এক পাঁজা

ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেবা নিজের ঘরে গিয়া নিজের বাক্স খুলিয়া দুটি বড় সুন্দর জাপানী ফুলদানী বাহির করিল; এই ফুলদানী দুটি বাঁশের ফাঁপা চোঙা, তার গায়ে জাপানী কারিগরের নিপুন হাতের বিচিত্র নক্সা ও ছবি খোদা ও আঁকা আছে।" সেবা এই ফুলদানী দুটি একবার প্রাইজ পাইয়াছিল। এতদিন ত এগুলি কোনো কাজে লাগে নাই। আজ এদুটিকে বাহির করিয়া হাতে তুলিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তার নক্সা ছবি কারুকার্য দেখিতে লাগিল —ফুল রাখিবার উপযুক্ত পাত্র বটে! দেখিতে দেখিতে পুরাতন জিনিসের সঙ্গে নূতন পরিচয়ে সেবার মুখ মুগ্ধ মনের আনন্দে ফুল-গুলির মতই সুন্দর হইয়া উঠিল। সে চোঙা দুটিতে জল ভরিয়া তাতে ফুলগুলিকে সাজাইয়া রাখিল। তারপর দুহাতে দুটি ফুল-দানী লইয়া সুমতির ঘরে হাসিমুখে গিয়া ঢুকিল।

সেবার দুই হাতের ফুলের তোড়ার মাঝখানে আর-একটি ফুলের তোড়ার মতন তার হাসি-হাসি মুখ ও আনন্দ-উজ্জ্বল চোখদুটি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সুমতি ডাকিলেন—এস গো ফুলরাণী, এই মরণাচ্ছন্ন বাড়ীকে তুমি আবার প্রাণের পুলকে সুন্দর আনন্দিত কোরে তুলছ।

সেবা লজ্জিত মুখে একটি ফুলদানী সুমতির পায়ের কাছে একটা তেপায়া টুলের উপর রাখিতে গেল। তাহা দেখিয়া সুমতি বলিলেন —এই ফুল হীরুর ঘরে দাওগে, সে ফুলের পাগল।

সেবা নত হইয়া ফুলদানী রাখিতেছিল, সেই অবস্থায় থামিয়া মুখ কাত করিয়া সুমতির দিকে চাহিয়া বলিল—একটা আপনার ঘরে থাক, একটা ওঘরে দিয়ে আসছি।

সুমতি বিষণ্ণ হাসিতে দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন—আমার ঘরে আর ফুল কি হবে? তুমি ও-দুটোই হীরুকে দাওগে।

সেবা লজ্জিত হাসিমুখে দুটি ফুলদানী হাতে তুলিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল— দুটোই ওঘরে দেবো তা হলে?

সুমতি ঘাড় কাত করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হীরুর খাটের দুপাশে দুটো সাজিয়ে দাওগে।

সেবা ফুলদানী দুটি হাতে করিয়া হীরকের ঘরে গিয়া ঢুকিল, তখন লজ্জায় তার মুখ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সেবাকে ফুল লইয়া আসিতে দেখিয়া হীরকের দৃষ্টিও অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া তাকে অভ্যর্থনা করিল। সেবা হীরকের খাটের দুপাশে দুটি উঁচু টুলের উপর ফুলদানী দুটি নামাইয়া রাখিতে গেল। হীরক চোখ ঘুরাইয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ! কী সুন্দর ফুলদানী দুটি! আপনি আমার চোখের সামনে একটু তুলে ধরুন অনুগ্রহ কোরে, আমি একবার ভালো করে দেখি।

সেবা খুশী মনে হাসিমুখে ফুলদানী তুলিয়া হীরকের চোখের সাম্‌নে ধরিল এবং ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া বাঁশের চোঙার গায়ে কারু-কার্য দেখাইতে লাগিল। হীরক আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ! খুব সুন্দর ত! এ দুটি আপনার, না?

সেবা বলিল—হ্যাঁ, আমি একবার প্রাইজ পেয়েছিলাম।

হীরক উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—আপনি কেমন করে জানলেন যে আমি ফুল ভালবাসি? মা বলেছেন বুঝি?

সেবা বলিল—ফুল নিয়ে আসছিলাম যখন তখন মার কাছে শুনলাম আপনি ফুল ভালোবাসেন। আমি নিজে ফুল খুব বেশী ভালোবাসি, তাই মনে হলো ফুল দেখলে আপনিও খুশী হবেন হয়ত।

হীরকের চোখ মুখ কৃতজ্ঞ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—আপনিও বুঝি ফুল খুব ভালোবাসেন? এখানকার বাগান মালী সব নিজের মনে কোরে সব ফুল আপনি নেবেন। এই-রকম ফুলদানীতেই ফুল মানায়। এ ফুলদানী আপনার ঘরে সাজিয়ে রাখলেন না কেন?

সেবা সে প্রশ্নের উত্তর কেবল হাসিয়া দিয়া ফুলদানী দুটি টুলের

উপর রাখিয়া দিল, তারপর বলিল—চারটে বাজে, আপনার খাবার সময় হয়েছে। আমি আপনার খাবার নিয়ে শিগগির আসছি।

হীরক বলিল—আপনি কেন কষ্ট করবেন? লোকেরা নিয়ে আসবে এখনি।

সেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল—আমি এখনি আসছি।

সেবা চলিয়া গেলে হীরক অনুভব করিল সেবা কাছে থাকিলে সে আনন্দ অনুভব করে, তার অদর্শনে মনে অভাব বোধ হয়। এক বেলার যত্নেই সেবা তার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে। সে একলা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে, চাকর দাসী ভিন্ন আর কেউ তার সঙ্গী নাই, কারো সঙ্গে একটা মনের কথা বলিবার উপায় ছিল না; এখন এমন একজন লোক তার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে যে তার আত্মীয়ের মতন কেবল যত্নই করিবে না, যার সঙ্গে বন্ধুর মতন বিশ্বসংসারের অনেক বিষয়েই আলোচনা করিয়া বিশ্বসংসার হইতে বিচ্যুত থাকার অভাব ও দুঃখ লাঘব করিতে পারিবে। এই বন্দী-দশার সহচরী হইয়া সেবা তার পরলোক-যাত্রার অপেক্ষার দুঃখটা ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে, কিন্তু শীঘ্র যে তার মৃত্যু হইবে এ সম্বন্ধে হীরকের কোনো সন্দেহ ছিল না; রমাকে ছাড়িয়া সে যে এখনও বাঁচিয়া আছে সে কেবল তার মার জন্য, মা গেলেই সেও সঙ্গে-সঙ্গে যাইবে নিশ্চয়।

হীরকের চিন্তায় বাধা দিয়া সেবা ঘরে আসিয়া ঢুকিল—তার মুখে হাসি, সর্ব অবয়বে তৎপর নিপুণতার চঞ্চলতা, আর তার দুই হাতে বাটি গেলাস রেকাবি। সেবা হীরকের খাটের পাশে আসিয়া হাতের সামগ্রী টুল তেপায়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতে লাগিল। সেই-সব জিনিসের মধ্যে ফিডিংকাপ দেখিয়া হীরক বলিল—ফিডিংকাপ পেয়েছেন দেখছি।

সেবা ফিডিংকাপে বেদানার রস ঢালিয়া হীরকের মুখের কাছে

ধরিয়া বলিল—হ্যাঁ, খুঁজে বার করে সাবান দিয়ে ধুয়ে এনেছি। এটুকু খেয়ে ফেলুন।

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—ওতে কি?

সেবা বলিল—বেদানা আর আনারসের রস কোরে এনেছি।

হীরক বলিল—এসব আমাকে এতদিন চিবিয়ে খেতে হত আর ছিব্‌ড়ে ফেলতে গাময় পড়ত।

সেবা হীরকের কথার মধ্য হইতে তার খুশী ও কৃতজ্ঞতার আভাস পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া শুধু হাসিল। হীরক ফলের রস পান করিতে লাগিল। বাটির মুখনলে চুমুক দিয়াই তার হঠাৎ মনে হইল এই বাটিটা পাওয়াতে তার খাওয়ার সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু এটা না পাওয়া গেলে সেবা তাকে বাহুবেষ্টনে তুলিয়া খাওয়াইত। এর কোন্‌টাতে যে তার তৃপ্তি বেশী হইত তাহা আর না ভাবিয়াই হীরক বলিল—বাটিটা ভাগ্যিস পেলেন, নইলে আপনাকে বার বার আমায় টেনে তুলে খাওয়াতে হত। আপনার তাতে কষ্ট হত।

সেবা হাসিয়া বলিল—আমার কষ্টের চেয়ে আপনার কষ্টই বেশী। আপনি অসুস্থ।

হীরক চুপ করিয়া রহিল, সেবার এই কথায় তার মন সায় দিল না।

সেবা হীরককে খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে একটু অনুযোগের স্বরে বলিল—আপনি ডাক্তার দেখান না, ওষুধ খান না কেন?

হীরক হঠাৎ উষ্ণ হইয়া উঠিয়া বলিল—ডাক্তারের নাম আমার কাছে করবেন না। ওরাই ত আমার সর্বনাশ করেছে। রমাকে যদি না বাঁচাতে পারল তবে আমায় বাঁচাল কেন এইরকম বেঁচে মোরে থাকবার জন্যে? যত শিগগির আমি মরতে পারি…

হীরকের কথা তখনো শেষ হয় নাই, কামিনী ঝি ছুটিয়া আসিয়া সেবাকে বলিল—দিদিমণি, দিদিমণি, মার মূচ্ছো হয়েছে, শিগগির আসুন।

সেবা কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইতে যাইতে লোকনাথকে বলিয়া গেল—লোকনাথদাদা, শিগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডাক্‌তে বলো।

॥ ৯ ॥

অনেক চেষ্টার পর সুমতির জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মৃত্যু ক্রমশই আসন্ন হইতেছে। একটু কথা বলিতে পারিয়াই তিনি চোখের ইসারায় অস্ফুটস্বরে সেবাকে কাছে ডাকিলেন। সেবা তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি মা?

সুমতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরুর কাছে কে আছে?

সেবা বলিল—লোকনাথ-দাদা আছে।

—তুমিই তার কাছে কাছে থেকো মা, তুমিই তাকে দেখো।

—আমি ত তাঁর কাছেই ছিলাম। আপনার মূর্চ্ছা হতে···

—আমার জন্যে তোমার কিচ্ছু কষ্ট কর্‌তে হবে না, আমার ত সময় ফুরিয়ে এল বোলে। আমি হীরুকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি--তুমি তাকে সুস্থ কোরে তুলো।

—আমি প্রাণপণে তাঁর যত্ন করব। তিনি নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবেন। তাঁর চেহারায় রোগের ত কোনো চিহ্ন নেই; তাঁর অসুখ মনের।

সুমতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সেই অসুখ সারাবারও ভার তোমাকেই নিতে হবে। আমার বৌমার অভাবেই তার মন ভেঙে পড়েছে। সেই অভাব তোমাকে পূরণ করতে হবে। আমার হীরুকে তুমি বিয়ে করো। তা হলে তুমি তাকে নিজের জেনে যত্ন করবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব।

সেবা সুমতির এই অকস্মাৎ প্রস্তাবে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

এ কথার যে কি উত্তর দিবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। হীরক সুন্দর সুপুরুষ ধনী, কিন্তু পক্ষাঘাতে শয্যাগত; তাকে বিবাহ করিলে এই বিপুল ঐশ্বর্যে তার অধিকার জন্মিবে, কিন্তু জীবনটা হয়ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। হীরক যদি ভালো নাই হয়? যদি সে বেশীদিন নাই বাঁচে? তবে সেবার কি অবস্থা হইবে?

সেবাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, যেন তার মনের কথা টের পাইয়া সুমতি বলিলেন—হঠাৎ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া কঠিন বোধ হবে জানি। কিন্তু আমার ত আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। খুব খারাপ দিকটাই মনে নিয়েই তুমি ভেবে দ্যাখো—হীরু যদি শিগগির মারাই যায়, কি বহুকাল শয্যাগতই থাকে, তাহলেও এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমার হবে। এই অর্থের বিনিময়েই তোমার সামর্থ আমি কিনতে চাচ্ছি—এখন শুধু এইটেই ভেবে নাও। তুমি মনে করো যে তুমি মাইনে নিয়ে হাসপাতালের রোগীরই পরিচর্যা করছ। কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এই মনে হচ্ছে—তোমার ভালোবাসা পেলে হীরু ভালো হয়ে উঠবে। মা-ছোড় অসহায়কে দয়া কোরে যত্ন করতে করতে তাকে হয়ত তুমিও ভালো-বাসতে পারবে। ঐ লোহার সিন্দুকটা খোলো ত মা। ওর ভেতর একটা হাতবাক্স আছে, সেইটে বার কোরে আনো।

সেবা উঠিয়া গিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল; এবং সুমতির নির্দেশ-মতো তাহা খুলিয়া তাঁর সামনে রাখিল!

সুমতি বলিলেন—ওর মধ্যে একটা মেডেল-গাঁথা হার আছে, বার করো ত মা।

সেবা সেই হারগাছি বাহির করিল; সেই হারছড়া দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাতে মেডেলের সারি দেখিয়া সেবার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুমতি বলিলেন—ঐ অতগুলো মেডেল আমার হীরুর পৌরুষের

উপার্জন। এই লোক কি এই রোগ কাটিয়ে ভালো হয়ে উঠতে পারবে না? তুমিই ত বল্‌লে মা, তার রোগ দেহে নয়, মনে। সেই মন চিকিৎসার ভার নাও তুমি, তার সহধর্মিনীর অভাব পূরণ কোরে।

সেবা চুপ করিয়া হারগাছির দিকে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল।

আনন্দবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সুমতি কথা কহিয়া ক্লান্ত হইয়া চুপ করিলেন এবং সেবা চুপ করিয়া আছে দেখিয়া আনন্দবাবু সেবাকে বলিলেন—এতে এত ভাবনার কি আছে ভাই? তুমি মত দাও এই বিয়েতে—হীরক বড় ভালো ছেলে, সকল বিষয়ে সে তোমার যোগ্য হবে। তা না হলে আমি কখনো তোমায় আনতাম না।

সেবা আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া আনন্দবাবু ও সুমতির মুখের দিকে শুধু চাহিল, কিছু বলিতে পারিল না। তার মনের মধ্যে তখন দ্বিধার দ্বন্দ্বের দোলা হাঁ ও নার মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল; একবার তার ইচ্ছা হইতেছিল স্বীকার করিতে আর একবার ভয় হইতেছিল—হীরক যদি ভাল না হয়, হীরক যদি মারা যায়, তবে?

সেবাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আনন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তবে আমি হীরককে বলতে যাচ্ছি।

সেবা বারণ করিতে যাইতেছিল। সুমতি এতক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; সেবার মুখে আপত্তির আভাস ফুটিয়া উঠিতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি অস্বীকার কোরো না মা। আমার মরবার সময় আমায় এই ভিক্ষাটি দয়া কোরে দাও। তুমি আমাকে মা বোলে স্বীকার করেছ, মার অন্তিম ভিক্ষা পূর্ণ করো।

সেবা পাছে অস্বীকার করে এই ভয়ে ও উদ্বেগে এবং অনেক কথা বলার ক্লান্তিতে সুমতির আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, তিনি মূর্চ্ছাচ্ছন্ন স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বলো মা বলো, আমি তোমার মুখ থেকে স্বীকার শুনে মরি।

সেবা তাড়াতাড়ি ষ্ট্রীকৃনিন ও ডিজিট্যালিস ট্যাবলেট জলে গুলিতে গুলিতে ব্যস্ত হইয়া বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না মা, আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব।

সুমতির আবল্য-আচ্ছন্ন মুখে সন্তোষের আভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবিষ্ট-চেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন, মনের আনন্দ তাঁকে সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা হইতে রক্ষা করিল।

আনন্দবাবু সেবাকে বলিলেন—তুমি এঁকে ছাখো, আমি তাহলে হীরকের কাছে যাই।

সেবা ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইল।

আনন্দবাবু হীরকের ঘরে গিয়া ঢুকিতেই হীরক উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—জ্যাঠামশায়, মা কেমন আছেন? আপনি ঠিক করে বলুন। এদের জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলে—ভালো আছেন, ভালো আছেন।

আনন্দবাবু হীরকের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছে। হার্টের অবস্থা বড়ই খারাপ। কখন্ কি হয় বলা যায় না।

হীরক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মাও আমাকে ফেলে চোলে যাবে? আমিই একলা এই অবস্থায় পোড়ে থাকব?

আনন্দবাবু হীরকের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—সেই ভাবনাতেই ত তাঁর অবস্থা আরো শিগগির শিগগির খারাপ হয়ে পড়ছে। একজন কারো ওপর তোমার ভার দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

হীরক বলিল—আপনারা ত এইখানেই থাকবেন? মাকে কি বলেন নি?

আনন্দবাবু বলিলেন—বলেছি। কিন্তু আমরা ত বুড়ো হয়েছি, আমাদের ভরসা আর কদিনের?

হীরক কান্নার মধ্যেও হাসিয়া বলিল—আপনারা সবাই যাবেন

আর আমিই থাকব? যত ভরসা কি এই পক্ষাঘাতে পঙ্গু আমার?

আনন্দবাবু সান্ত্বনা-ভরা স্বরে বলিলেন—তুমি বলিষ্ঠ যুবা, তুমি ইচ্ছে করলেই ত এ অসুখ ঝেড়ে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারো।

হীরক ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যেন সে বাস্তবিকই ভালো হইয়া উঠিতেছে এই ভয়ে জোরে বলিয়া উঠিল—না না আমি ভালো হব না, আমি ভালো হতে চাই নে।

আনন্দবাবু বলিলেন—তা হলে ত তোমাকে দেখবার শোনবার একটা লোকের আরো দরকার। সেই কথাই ত তোমার মা আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন।

হীরক উৎসুক কৌতূহলে দৃষ্টি ভরিয়া আনন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিল। আনন্দবাবু বলিতে লাগিলেন—এমন একজন লোক তোমার দরকার যার এক সঙ্গে তিনটি গুণ আছে—প্রথম, সে অল্পবয়সী হবে, দ্বিতীয়, সে মেয়ে হবে, তৃতীয়, সে আপনার ভেবে প্রাণের টানে তোমায় যত্ন করবে। এমন লোক সেবা। সেবা তোমার ভার নিলে তোমার মা নিশ্চিন্ত হতে পারেন বলছেন।

হীরক উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেবা কি এতে কিছু আপত্তি করছেন?

আনন্দবাবু বলিলেন—না, সেবা স্বীকার করেছে।

হীরক উৎফুল্ল হইয়া বলিল—তবে আর মার ভাবনা কিসের? সেবা একদিনেই ত আমাদের আপনার কোরে নিয়েছেন।

আনন্দবাবু বলিলেন—কিন্তু সেবা অবিবাহিতা; তার বিয়ে না হলে ত তার তোমার কাছে থাকা সঙ্গত হবে না।

হীরক বলিল—তা তিনি বিয়ে করুন না; তাঁর যাকে ইচ্ছে হয় বিয়ে করুন; তাঁদের যাতে কিছুর অভাব না হয় তার ব্যবস্থা আমি কোরে দেবো।

আমন্দবাবু বলিলেন—সেবার, তোমার মার, আর আমার ইচ্ছে যে তুমিই সেবাকে বিয়ে করো—তা হলে আর……

হীরক ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জ্যাঠামশায়! আপনারা কি পাগল হয়েছেন! বিয়ে করবার মতন অবস্থাই আমার বটে! রমা মরেছে এখনো দশদিন পেরোয়নি, আমি মরতে বসেছি, মা মর-মর, বিয়ে করবারই সময় ত এই! সেবা ত কচি খুকি নয় যে তাকে যে সৎপাত্রে সম্প্রদান করবেন তাকেই পতিদেবতা বোলে পূজো করবে, আর মন যদি বিদ্রোহী হয়ও তখনো অদৃষ্ট বোলে সান্ত্বনা খুঁজবে?

আনন্দবাবু বলিলেন—সেবা তোমাকে বিয়ে করতে স্বীকার করেছে।

হীরক বলিয়া উঠিল—কিসের লোভে? আমি মোরে গেলে আমার জমিদারী তার হবে বোলে? তা আমি পেতে দেবো না। কালই আমি সমস্ত সম্পত্তি রমার নামে মেয়ে-স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে দান করব।

আনন্দবাবু কোমল স্বরে বলিলেন—তোমরা এই রকম ভাববে বোলেই সেবা এখানে আসতে চায়নি, তোমার মার আগ্রহে আমার কথাতেই সে এসেছে। তুমি যদি তোমার সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষার জন্যে দান করো, তাতে আমরাও যেমন খুসী হব, সেবাও তেমনি খুসী হবে। মেয়েদের শিক্ষা পাওয়া যে কত দরকার তা তার চেয়ে আর কেউ বেশি নিজে ভুগে বোঝেনি।

আনন্দবাবুর কথায় সেবার উপর হীরকের বিরাগ অনেকখানি কমিয়া আসিল। তবু সে তীব্র বিরক্তির স্বরে বলিল—না না, অক্ষম আমাকে নিয়ে আপনাদের এরকম ছেলেখেলা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আমার জন্যে কারো ভাবতে হবে না, কারো আমার ভার নিতে হবে না; এই ঘরে আমাকে একলা পোড়ে থাকতে দিন, আমাকে আপনা হতে মরতে দিন, আপনারা আমাকে মারবেন না।

হীরক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। এই কয়দিন সে অনড় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল, আজ বিরক্তির উত্তেজনায় ঘাড় ফিরাইবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের পেশী ও স্নায়ুর কার্যশক্তি ফিরিয়া আসিল। বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হীরকের মন তার শক্তির এই প্রত্যাবর্তন অনুভব করিল না, কিন্তু আনন্দবাবুর চক্ষু ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি এই অবস্থায় হীরককে আর অধিক উত্তেজিত করা উচিত নয় মনে করিয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আনন্দবাবুকে প্রফুল্ল মুখে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুমতির মুখও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং সেবার মুখ লজ্জায় বিকশিত হইয়া অবনত হইয়া পড়িল, তাঁরা দুজনেই মনে করিলেন আনন্দবাবু হীরকের স্বীকার পাইয়া আসিয়াছেন। আনন্দবাবু নিকটে আসিলে সুমতি বলিলেন—তবে পুরুত ঠাকুরকে খবর পাঠিয়ে দেন, আজ রাতেই দুহাত এক করা দেখে আমি সুখে মরি।

আনন্দবাবু প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন—হীরক বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না যে কিছুতেই।

সুমতির মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; এবং সেবার মুখ প্রত্যাখ্যানের লজ্জায় কালো হইয়া গেল। সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে আপনি অমন খুসী হয়ে ফিরে এলেন যে?

আনন্দবাবু আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিলেন—হীরক আজ নিজে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে শিগগির ভালো হয়ে উঠবে।

আনন্দে সুমতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেবাও লজ্জা ভুলিয়া হাসি-হাসি মুখ তুলিয়া আনন্দবাবু ও সুমতির আনন্দে যোগ দিল।

এমন সময় লোকনাথ ধুনার ধোঁয়া লইয়া ঘরে আসিল এবং ধুনুচি রাখিয়া সেবাকে বলিল—খোকাবাবুর খাবার সময় হয়েছে।

সেবা অনেকক্ষণ হীরকের কোনো খোঁজ লয় নাই বলিয়া তার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তার বিবাহের প্রস্তাব হওয়াতেই

তার হীরকের কাছে যাইতে অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল ; এখন ত হীরক তাকে প্রত্যাখ্যান করাতে তার লজ্জার অবধি ছিল না, কর্তব্যের আহ্বানেও সে লজ্জার সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছিল না। লোকনাথ আসিয়া যখন ডাকিল, তখন তার অত্যন্ত কঠিন বিপদ বোধ হইল ; সে মুখ রাঙা করিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল—যাওয়া ও না-যাওয়া দুই তার পক্ষে তখন সমান কঠিন। সুমতি তার কুণ্ঠিত সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন—যাও মা, তুমি হীরুকে খাইয়ে দিয়ে এস।

সুমতির আদেশে রাজি হইয়া সেবা সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত মন্থর গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু হীরকের ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইতে তার যেন মাথা কাটা যাইতেছিল। সে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বারান্দার পাশে একটা বাতাবী লেবুর গাছ ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং কোথায় একঠা শিউলি গাছ আড়াল হইতেই ফুলের গন্ধে বাতাসকে একেবারে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকারে ঘন গন্ধের মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া সেবা লজ্জা সঙ্কোচ সব ভুলিয়া গেল—সে হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া পাতাসুদ্ধ লেবুফুল তুলিয়া তুলিয়া কোঁচড় ভরিতে লাগিল। নিজের হাতে ফুল তুলিতে পারার আনন্দে তার মুখখানিও ফুলের মতন প্রফুল্ল ও অন্তর মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। ফুল পাড়িতে-পাড়িতেই তার মনে হইল বিকাল বেলা সুমতি বলিয়াছিলেন—হীরু ফুলের পাগল, ফুল তাকেই দাও গে। সেবা হাতে কোঁচড়ে ফুল লইয়া হীরকের ঘরে যাইতে গিয়া দরজার কাছে আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তার আবার মনে হইল—এই তরুণ অপরিচিত সুন্দর যুবার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং সে তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এমন সময় হীরকের কথা তার কানে গেল—আ! কোথা থেকে লেবুফুলের চমৎকার গন্ধ আসছে!

লোকনাথ বলিল—ঐ বারান্দার ধারের গাছটায় খুব ফুল হয়েছে। তুলে আনব ?

হীরক কোনো জবাব দিল না, তার মনে পড়িল সেবাকে ; সে বিকাল-বেলা না চাহিতে কত ফুল আনিয়া তাকে উপহার দিয়া গেছে, আর এখন এই বুড়াটার কাছে চাহিলে তবে ফুল মিলিবে, নয়ত নয় ; সে যে ফুল ভালোবাসে এবং ফুলের গন্ধ পাইয়া যে সে নিজের আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিল, কেবল সেইটুকুর দরদে না-চাহিতেও দিতে পারার মতন লোক কেউ নাই ? হীরক অভিমানে বিরক্ত হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—আমি খেতে-টেতে পাব ? আজ সকাল থেকে বাড়ীসুদ্ধ লোকের তোদের কোন্ ভূতে পেয়েছে ?

হীরকের তিরস্কারে আকৃষ্ট হইয়া সেবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরের মধ্যে পা দিতেই বড় আলোর উজ্জ্বল দীপ্তি সুবর্ণ-প্রলেপের মতন আসিয়া সেবার মুখে পড়িল, আর সেই শোভার আভা প্রতিফলিত হইয়া হীরকের চোখে পড়িতেই হীরক চমকিত হইয়া তার দিকে ফিরিয়া চাহিল—তখন সেবার মুখে বিবাহ-বিমুখ পুরুষের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার লজ্জা, হীরকের খাবার বিলম্বে নিজের কর্তব্য অবহেলার জন্য কুণ্ঠা ও ব্যগ্রতা, ফুল পাওয়ার আনন্দের তৃপ্তির সঙ্গে হীরকের প্রশংসিত ফুল তাকে আনিয়া দিতে পারার উৎসুক আগ্রহ, এবং সমস্তর উপর প্রলেপের মতন হীরক যদি তাকে বিবাহ-প্রস্তাব হওয়ার জন্য কিছু বলে তার ভয়ের সঙ্কোচ তাকে অপরূপ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। হীরক যাকে উদ্দেশ করিয়া এখনি ভূত বলিয়া নির্দেশ করিল, সে তখনি-তখনি একেবারে দেববালার রূপ ধরিয়া তার দৃষ্টিকে মুগ্ধ সার্থক অতৃপ্ত করিয়া আবির্ভূত হইল ! হীরক ত সুন্দরী ঢের ঢের দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অপরিসীম শ্রী ও অনুপম লাবণ্য ত কোনো রমণীর মধ্যে দেখে নাই—এ ত শুধু রমণী নয়, এ যে রমণীয় ! হীরক অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টি প্রশংসায় ভরিয়া সেবার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হীরকের চোখে আনন্দ ও মুখে সন্তোষ দেখিয়া সেবার সঙ্কোচ কুণ্ঠা ভয় দূর হইয়া গেল, তারও মুখ আবার এক অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল, যেন চন্দ্র-সহোদরা শ্রীদেবী বৈকুণ্ঠে প্রথম পদার্পণ করিলেন। সেবা হাসিয়া বলিল—আপনার জন্যে ফুল পাড়তে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গেল। লোকনাথ-দাদা, বামুন ঠাকুরকে খাবার দিয়ে যেতে বলো।

লোকনাথ হীরকের উপচিত আনন্দে সুখী হইয়া প্রসন্ন মনে প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল, এবং সেবা নেবুফুলগুলি হীরকের বিছানার ধারে ধারে সাজাইয়া রাখিতে ব্যাপৃত হইল। না চাহিতে পাওয়ার সুখের আতিশয্যে হীরক কোনো কথা বলিতে পারিতেছিল না। পরের ইচ্ছা খুঁজিয়া পূরণ করে এমন মমতাময়ী মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া হীরকের এখন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; সেবা না-জানি কত আঘাত পাইয়াছে। তবু সে সেই বেদনা গোপন করিয়া আঘাতকারীকেই সেবা করিতে আসিয়াছে হাসিমুখে—এর কৃতজ্ঞতায় হীরকের মন সেবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া উঠিল। বামুন-ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, সেবা হীরককে খাওয়াইয়া আঁচাইয়া দিল, লোকনাথ উচ্ছিষ্ট খাবারের থালা লইয়া চলিয়া গেল—এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলিতে পারিল না। সেবাই নীরবতার সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি এখুনি ঘুমুবেন?

হীরক বলিল—ঘুম ত আমার হয় না। চোখ মেলে পোড়ে থাকতে থাকতে সেই ভোরবেলা একটু ঘুম আসে।

সেবা বলিল—আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি দেখুন।

হীরক হর্ষবিষাদে হাসিয়া বলিল—কেন আপনি পণ্ডশ্রম করবেন? আমার ঘুম আস্‌বে না।

সেবা বলিল—আমি মাসাজ্‌ কর্‌তে জানি। মাসাজ্‌ কোরে দিলে নার্ভ্‌স্‌ সুদৃড্‌ হয়, আর তাতে আপনি ঘুম আসে। আমি অনেক ইন্‌সম্‌নিয়া পেশেণ্টকে এইরকম কোরে ঘুম পাড়িয়েছি।

সেবার যত্ন করিবার আগ্রহ ও চেষ্টা দেখিয়া হীরক মুগ্ধ হৃদয়ে নম্রস্বরে বলিল—আপনি আমাদের জন্যে এত করছেন, আমাদের কোনো সাধ্য নেই যে আপনার কাছে কোনো রকমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমি যদি কখনো আপনার প্রতি কোনো রূঢ় ব্যবহার কোরে ফেলি, তাহলে আমার রূড্‌নেস আপনি ক্ষমা করবেন। তাতে আপনাকে আমি অসম্মান করছি এ কিছুতেই আপনি বিশ্বাস করবেন না।

সেবা ক্ষিপ্রগতিতে হীরকের গায়ে হস্তচালনা করিয়া দ্রুত-কম্পনে তার অঙ্গের পেশী স্নায়ু সংবাহন করিতে করিতে বলিল—আমি জানি যে আপনি ভদ্রলোক, আপনি কোনো অফেন্স মিন্ করতে পারেন না। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না—আপনি মনটাকে ভেক্যাণ্ট করতে চেষ্টা করুন ত—এখুনি ঘুম আসবে।

সেবার হস্ত-সঞ্চালনে হীরকের অঙ্গে-অঙ্গে যে দ্রুত কম্পন চলিতেছিল তারই একটা অনির্বচনীয় কৌতুকে ও আনন্দে হীরকের চেতনা আস্তে আস্তে আরামে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

হীরককে ঘুমাইয়া পড়িতে দেখিয়া সেবার মুখ কৃতকার্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে হাসিমুখে হীরকের ঘর হইতে বাহির হইয়া সুমতির কাছে যাইতেই তিনি তার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা, হীরু কি করছে?

সুমতি সেবাকে বৌমা বলিয়া সম্বোধন করাতে সেবার মুখে আনন্দের উপর লজ্জার আভা আসিয়া পড়িল, যেন নানান-রঙা ফানুসের ভিতর হইতে আলোর আভা ঝরিয়া পড়িতেছে। সেবা নিজের সফলতার উৎফুল্ল আনন্দকে লজ্জার অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া, কোমল স্বরের মৃদুতার অন্তরালে নিজের কৃতকার্যতার সংবাদ দিবার আগ্রহ সরাইয়া রাখিয়া বলিল—ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম মা।

সুমতির মুখ আনন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সেবার মুখে হাত

বুলাইয়া আনিয়া হাত চুম্বন করিলেন। স্নেহকোমল-স্বরে বলিলেন—সমস্ত দিন খাটছ মা, এখন খেয়ে গিয়ে শোওগে।

সেবা সমস্তদিনের পরিশ্রমে যথার্থই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

॥ ১০ ॥

রাত তখন বারোটা। কামিনী ঝি আসিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত স্বরে সেবাকে ডাকিল—বৌদিদি, বৌদিদি, শিগ্‌গির ওঠো—মার আবার মূর্চ্ছা হয়েছিল; তোমায় ডাকছেন।

সেবা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তারপর চোখ রগড়াইয়া গভীর নিদ্রার জড়তা দূর করিতে করিতে কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেবাকে সুমতি ডাকিয়াছিলেন বৌমা বলিয়া, এবং এখন কামিনীও বৌদিদি বলিয়া ডাকিল; তাতে সেবা বুঝিল যে হীরক তাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলেও, সুমতি তাকে বধূ বলিয়াই সকলের কাছে পরিচিত করিয়াছেন; এতে সেবা লজ্জার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেখেলার কৌতুকও অনুভব করিল। সেবা সুমতির কাছে যাইতেই তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—আমার আর বেশী দেরী নেই, পুরুত এসেছে; তোমাদের দু'হাত এক হওয়া দেখে আমি যাব।

গভীর ঘুম হইতে আচমকা জাগিয়া আসিয়া সুমতির এই কথা সেবার স্বপ্নের ঘোরের মতন বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে হীরকের চীৎকার শোনা গেল—না, না, না—আপনাদের আমি কতবার বলব যে অক্ষম আমাকে নিয়ে আপনারা ছেলেখেলা করবেন না।

সুমতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—কামিনী, লোকনাথকে ডাক, আমাকে চারজনে ধরাধরি করে আমায় হীরুর ঘরে নিয়ে চলুক।

ডাক্তার ইহা শুনিয়া ভয় পাইয়া বলিল—এ অবস্থায় নাড়া-চাড়া করলে যে বড় খারাপ হবে।

সুমতি ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিলেন—খারাপ মানে ত মৃত্যু। সে ত পলে পলে এগিয়ে এসে বুকে চেপে বসছে টের পাচ্ছি। আমি ওঘরে যাব। মরবার আগে একবার হীরুকে দেখে মরব।

সুমতির অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। ডাক্তার আর বাধা দিল না। লোকনাথ ও আরও চার-পাঁচজন চাকর সুমতিকে বিছানার তোষক বালিশ সুদ্ধ তুলিয়া একটা হাল্কা নেয়ারের খাটে শোয়াইল এবং সেই খাট বহিয়া লইয়া হীরকের ঘরে চলিল।

সুমতিকে চাকরেরা বহিয়া আনিতেছে দূর হইতে দেখিয়াই হীরক কাতর আবেগে ডাকিয়া উঠিল—মা!

সেই স্বর শুনিয়া সুমতি স্নেহার্দ্র ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন—বাবা আমার।

সুমতির খাট একেবারে হীরকের খাটের গা ঘেঁসিয়া রাখা হইল। হীরক মাকে চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—এ কান্নার মধ্যে মিশিয়া ছিল মা ও ছেলে শয্যাগত হইয়া পড়ার পর প্রথম সাক্ষাতের আনন্দ, মার ও নিজের অবস্থার জন্য দুঃখ, মার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা, প্রিয় পুত্রবধূর মৃত্যুতে শোকাতুর মার কাছে পত্নীবিয়োগবিধুর পুত্রের শোক, মার অসঙ্গত ও অশোভন আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ ও অভিমান, এই অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর-একজন প্রায়-অপরিচিতার সঙ্গে যোগ করিয়া দিবার চেষ্টার জন্য বিরক্তি।

সুমতি অবশ হাত তুলিবার চেষ্টা করিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না; সেবা হাত ধরিয়া তুলিয়া হীরকের মাথায় রাখিয়া দিল। সুমতি ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন—বাবা হীরু!

আনন্দবাবু হীরককে বিবাহের অনুরোধ করিতে আগেই আসিয়া

সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ডাকিলেন—হীরক, তোমার মা ডাকছেন, শুনছ।

হীরক কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—মা ?

সুমতি বলিতে লাগিলেন—তুমি ত আমার কথার অবাধ্য কখনো হওনি বাবা। আমার এই শেষ অনুরোধটি রাখো। তুমি সেবাকে বিয়ে করো, আমি দেখে মরি, আজকের রাত পোয়ানো আমিআর দেখব না।

হীরক কোনো উত্তর না দিয়া শিশুর মতন কেবলি কাঁদিতে লাগিল। সে মার আদেশ কখনো অবহেলা ত করে নাই; এখন সেই মার আদেশ রাখা বা অবহেলা করা দুই তার কাছে সমান কঠিন বোধ হইতেছিল।

হীরককে নিরুত্তর দেখিয়া সুমতি আনন্দবাবুকে বলিলেন—বড়্‌ঠাকুর, পুরুতঠাকুরকে ডেকে কন্যা-সম্প্রদান করুন, আর দেরী করলে আমি দেখতে পাব না।

পুরুত নীচেই অপেক্ষা করিতেছিল। সে আসিয়াই মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল আনন্দবাবু যখন সেবার হাত তুলিয়া হীরকের হাতে রাখিয়া মন্ত্র পড়িতেছিলেন—সবস্ত্রাচ্ছাদিতালঙ্কৃতং প্রজাপতি-দেবতাকাং অর্চ্চিতাং এনাং কন্যাং তুভ্যম্ অহং সম্প্রদদানি—তখন আনন্দের আন্দোলনে সুমতির বুকের মধ্যে একবার ধকধক করিয়া উঠিল, এবং তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ-বিয়োগ ঘটিল।

ইহা দেখিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দবাবু মন্ত্রপড়া ভুলিয়া চঞ্চল হইয়া সুমতির মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হীরক ব্যাকুল হইয়া 'মা মা মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হীরকের নিস্পন্দ নড়নশক্তিহীন হাতের উপর হাত রাখিয়া সেবা পাংশুমুখে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার মনে হইতেছিল এ কী ভীষণ ভয়ঙ্কর তার বিবাহ! প্রত্যক্ষ মৃত্যুকে সাক্ষী করিয়া এই বিবাহ!

কিন্তু কোথায় রহিল পুরোহিতের মন্ত্র পড়ানো, কোথায় গেল আনন্দবাবুর কন্যা সম্প্রদান,—সমস্ত লোক তখন সুমতিকে লইয়াই ব্যস্ত। হীরক যেন কাঁদিয়াই নিজের প্রাণটাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। সেবারও চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সে হীরকের হাত হইতে নিজের হাত তুলিয়া লইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

॥ ১১ ॥

হীরক ও সেবার অর্ধসমাপ্ত বিবাহ অসমাপ্তই রহিয়া গেল; যাঁর জেদে এই বিবাহ হইতেছিল সেই সুমতির মৃত্যুতে সব উদ্‌যোগ স্থগিত হইয়া গেল। এখন বাড়ীর কর্তার মধ্যে ত আনন্দবাবু; তিনি হীরকের মনের অবস্থা দেখিয়া হীরককে আঁর কোনো কথাই বলিতে পারেন না। সেবা নিজের বিবাহের কথা ত নিজে কিছু বলিতে পারে না; এক-একবার তার মনে হইতেছিল বটে যে বিবাহের সম্পর্ক যখন হীরকের সঙ্গে তার হইলই তখন অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হইয়া গেলেই ভালো হইত, কিন্তু সে নিজের বিবাহের কথা কেমন করিয়া কাহাকে বলিবে? অধিকন্তু সুমতির মৃত্যুতে সেবার মনেও অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল; মাত্র একটি দিনে সেবা যে স্নেহের আস্বাদ সুমতির ব্যবহারে পাইয়াছিল, আবাল্য-মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত সেবার চিত্ত তাতেই মুগ্ধ হইয়া তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে ভালোবাসায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত লাভ অকস্মাৎ হারাইয়া সেবার মন বড়ই কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজের মন দিয়া বুঝিতে পারিতেছিল হীরকের মনে কি কষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হীরকের সঙ্গে তার যে বিবাহের একটা সম্পর্ক তার মা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তার অনুষ্ঠানটা যে সম্পূর্ণ হয় নাই ইহা সেবা হীরককে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে সুমতির মৃতদেহ যখন সৎকার করিতে লইয়া

যাওয়া হইল, তখন প্রশ্ন উঠিল—তাঁর মুখ-অগ্নি করিবে কে? হীরক অশ্রুপ্লাবিত চোখের কাতর দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেবা কি এখানে আছেন?

আনন্দবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, সেবা আছে।

সেবা হীরকের খাটের মাথার দিকে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল; সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হীরকের দৃষ্টির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কান্নাভাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছেন আমাকে?

হীরক দেখিল সেবার চক্ষে জল, মুখ শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন, স্বরে তার ব্যথার কোমল কাঁপন; তাঁর মার জন্য এই নবাগতারও দুঃখ অনুভব করিয়া হীরকের মন সেবার প্রতি কৃতজ্ঞ ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল; সে কোমল কাতর স্বরে সেবাকে বলিল—আমার ত নড়বার শক্তি নেই; তুমি কি আমার হয়ে মাকে বিদায় দিয়ে আসতে পারবে?

হীরকের কথা শুনিয়া সেবার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; হীরক যে তাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে—এ বিষয়ে সেবার আর কোনো সন্দেহ রহিল না;—হীরক তাকে তুমি বলিয়া কথা কহিল এবং হীরকের প্রতিনিধি হইবার অধিকার দিল। সেবা আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি বলিল—পারব।

হীরক আর কিছু বলিল না। সেবা ও আনন্দবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শাশুড়ীর সৎকার করিয়া সেবা যখন বাড়ীতে ফিরিল তখন বেলা প্রায় একটা। সেবা ক্লান্ত শুষ্ক ম্লান মুখে বাড়ীতে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি আগে হীরকের কাছে আসিল। তাকে ফিরিতে দেখিয়াই হীরক ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মার সব শেষ হয়ে গেল?

সেবারও দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে নীরবে আসিয়া হীরকের মুখের কাছে দাঁড়াইল। সেবাকে আসিতে দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে লোকনাথও সেইখানে আসিল। সেবা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল—লোকনাথ-দাদা, খাওয়ানো হয়েছে?

লোকনাথ চোখ মুছিয়া বলিল – না। আপনি ফিরে না এলে খাবেন না বললেন।

সেবা ব্যস্ত হইয়া বলিল—বেলা যে অনেক হয়েছে, খাবার নিয়ে এস।

হীরক স্নেহসিক্ত স্বরে বলিল—আমার জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি আগে খাওগে, তারপর আমায় খাইও। রোদে হেঁটে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, তুমি অসুখ কোরে পড়লে তোমাকেই বা কে দেখবে আমাকেই বা কে দেখবে—এখন ত আর আমাদের মা নেই?

হীরকের অশ্রু আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হীরকের স্নেহের স্পর্শে সেবার মন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল; পারিবারিক জীবনের মধুর রসাস্বাদ যেটুকু সে এখানে আসিয়া পাইল তার আবাল্য-স্নেহবঞ্চিত জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা বলিয়া অভিনব ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছিল। সেবা তোয়ালে দিয়া হীরকের মুখ চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—আপনি একটু খেয়ে নিন, তারপর আমি খাচ্ছি। লোকনাথদাদা, বামুন ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বলো।

লোকনাথ চলিয়া যাইতেছিল। হীরক বলিল—এখন ত বামুনের রান্না খেতে নেই; এ কদিন অন্য কিছু খেয়েই কাটিয়ে দেবো।

সেবা বলিল—আমি হবিষ্যি রেঁধে দেবো।

হীরক সন্তুষ্ট হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, তোমার অত কষ্ট করতে হবে না।

সেবা বলিল---আমারও ত অন্যের হাতে খেতে নেই, আমার নিজের জন্যে রাঁধতে হবে ত।

খ্রীষ্টান মিশনারী মেমের কাছে মানুষ ও খ্রীষ্টানী স্কুলের মাষ্টারনী সেবা হিন্দুয়ানীর এইসব আচার নিজে পালনীয় না মনে করিলেও হীরকের তুষ্টির জন্য পালন করিতে প্রস্তুত হইল। এবং তার এই সহজ আচরণে হীরক ভুলিয়া গেল যে সেবা তাকে খাওয়াইবার জন্যই

নিজে রাঁধিতে স্বীকার করিতেছে। হীরক খুব খুসী হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। লোকনাথ হীরকের খাবার আনিতে গেল।

সেবা হীরককে জল-খাবার খাওয়াইয়া তাড়াতাড়ি রাঁধিতে গেল। হবিষ্য রাঁধিয়া লইয়া সেবা নিজে থালায় ভাত বাড়িয়া ব্যস্ত ভাবে যখন ঘরে আসিল তখন বেলা একেবারে গড়াইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন অনাহারে ও শোকে সেবার মুখ ত শুকাইয়াই গিয়াছিল, তার উপর আগুন-আঁচ লাগিয়া তাত-পাওয়া ফুলটির মতন দেখাইতেছিল। সেবা ব্যস্ত দ্রুত পদে হীরকের কাছে যাইতে যাইতে মমতা-ব্যগ্র স্বরে বলিল—আজকে আপনার কত অনিয়ম হয়ে গেল। বেলা একেবারে গড়িয়ে গেছে।

হীরক প্রতিক্ষণে সেবার যত্ন করিবার সহজ আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল; যেন মা তার অসহায় শিশু সন্তানকে যত্ন করিতেছে। হীরক রমার মধ্যে কেবল মধুময়ী প্রণয়িনী পত্নীরই সন্ধান পাইয়া পুলকিত ও তৃপ্ত ছিল; কিন্তু সেবার মধ্যে সে পাইতেছিল একাধারে মাতার মমতা, বন্ধুর সহমর্মিতা, এবং দাসীর সেবাপরায়ণতা; হীরকের তখন মনে হইল ইন্দুমতী সম্বন্ধে অজের ধারণার কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু সে অনুভব করিতে চাহিতেছিলও না, পারিতেছিলও না, সেবার সঙ্গে প্রণয়িনী পত্নীর সম্পর্ক। সে আর বেশি দিন বাঁচিবে না, সেবা বেচারী আজীবন বিধবা থাকিয়া কষ্টই যে পাইবে তাহা কিসের জন্য? এই দারুণ দুঃখ স্বীকার করিতেছে সে বিনিময়ে কি পাইয়া? কিছু সম্পত্তি? বস্তু ও বিষয় কি মনের অভাব ভরাইতে পারে? আবাল্য দারিদ্রে পীড়িতা চিত্তবৃত্তির ব্যাপারে অনভিজ্ঞা সেবা ধনের লোভেই নিজেকে এত সহজে ও সস্তায় বিকাইয়া দিয়াছে যে তাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু হীরকের মৃত্যুর পর

সে যখন জীবনখাতার পাতে লাভ-লোকসানের অঙ্ক মিলাইয়া দেখিতে পাইবে যে সে কি ঠকাই ঠকিয়া গেছে, তখন সে নিজেকে ত দুষিবেই, প্রতারক প্রবঞ্চক বলিয়া আরো অনেককেই দুষিতে তার ইচ্ছা হইবে। এই সব কথা মনে হইতেই হীরক সেবার উপর কেমন একটু অনুকম্পামিশ্র করুণা ও মায়া অনুভব করিতে লাগিল, তার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতন একটু কৌতুকরসও গোপন হইয়াছিল বোধ হয়। এই জন্য সেবার কথায় হীরক কোনো কথা বলিতে পারিল না ; সেবা তাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল ও সে নীরবে খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে হীরক সেবাকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি জলটল কিছু খেয়েছ ?

সেবা ম্লান মুখে বলিল—খেয়েদেয়ে কি হবিষ্যি রাঁধতে আছে ?

হীরক সেবার যত পরিচয় পাইতেছিল তত তার বিস্ময় বোধ হইতেছিল। হীরক বিস্ময়ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ছিলে কোয়েটায়, মানুষ হয়েছ মেমের কাছে, এত সব আচার-অনুষ্ঠানের খবর তুমি কোথায় পেলে ?

সেবা বলিল—আমি চোখ মেলে চলতে চেষ্টা করি আর আমার দেশের মধ্যেও থাকতে চেষ্টা করি, তাই আমি এ সব জানতে পেরেছি।

হীরক বলিল—সন্ধ্যে হয়ে এল। তুমি আর দেরী কোরো না ; খেয়ে নাওগে। আমায় ত তুমি খাইয়ে গেলে ; কিন্তু তোমার খাওয়া হল কি না তা দেখবার শক্তি আমার নেই, তুমি নিজে নিজের যত্ন কোরো।

হীরকের স্বরে একটা হতাশ অসহায় অবস্থার ব্যথা ও সেবার প্রতি মমতার সুর বাজিয়া সেবার মন স্পর্শ করিল। সেবা বলিল—আপনি উঠে আসুন না। আপনি ইচ্ছে করলেই ত উঠতে পারেন। আপনার ত ইচ্ছা-অসুখ।

হীরক একটু বিরক্ত একটু ব্যথিত হইয়া বলিল—ভীষ্মের মতন যদি

আমার ইচ্ছামৃত্যু হত তাহলে আমি একদিনও ইচ্ছে-অসুখে বিছানায় পোড়ে থাকতাম না, তোমাকেও কষ্ট দিতাম না।

এই কথা শুনিয়া সেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। হীরকের মনে হইল যেন সে লক্ষ্য করিল সেবার মুখে বিরস বিরক্তি। হীরককে সেবা সুস্থ হইয়া উঠিতে দেখিতে চায়, সে তার মৃত্যুর কথা শুনিতেও চায় না, এতে হীরক মনে মনে খুশী হইল, যদিও তার মন তখনই বলিয়া লইল—সে নিজে ত ভালো হইতে চায়ও না, ভালো হইবেও না। কিন্তু এই শ্যামলা ধরিত্রীর কোলে এতকাল থাকিয়া একদিন যখন সে চলিয়া যাইবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, তখন অন্তত একজনও তার অভাবে বিলাপ করিবে না,—এই সম্ভাবনা যে বড় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়; এখন এমন একজন লোক হয়ত থাকিবে যার মনের মধ্যে সে একটু ব্যথা একটু অভাববোধ রাখিয়া যাইতে পারিবে। মানুষ একেবারে লুপ্তস্মৃতি হইয়া মুছিয়া যাইতে চায় না, তাই তার বংশরক্ষার আগ্রহ, তাই উত্তরাধিকারী না থাকিলে সে পোষ্যপুত্র লয় অথবা সম্পত্তি দান করিয়া নিজের স্মৃতি স্থায়ী করিবার কামনা করে; কোথাও সে বাঁচিয়া রহিবে এই আশাতেই সে মরিতে পারে, মরা তার সহজ হয়। হীরক মনে করিল এইবার তারও মরা সহজ ও সুখকর হইবে।

॥ ১২ ॥

রমার মৃত্যুর আজ দশাহ। সেবা ভোরবেলা উঠিয়া বাগানে গিয়া নিজে হাতে নানাবিধ ফুল তুলিয়া আনিল। তারপর স্নান করিয়া সে হীরকের ঘরে নিঃশব্দে যখন আসিল, দেখিল হীরক তখনও ঘুমাইতেছে। হীরকের ঘরের দেয়ালে রমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, সেবা সেটি সন্তর্পণে নামাইয়া আনিয়া হীরকের খাটের কাছে একখানি চেয়ারের উপর চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়া

খাড়া করিয়া রাখিল এবং ফুলের ঝুড়িটি আনিয়া ফুল দিয়া সেই ফটোখানিকে সাজাইতে লাগিল।

বহু ফুলের পুঞ্জিত ঘন গন্ধে হীরকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চোখ মেলিয়াই দেখিল শরতের উষার অপূর্ব লাবণ্যে বাহিরের আকাশ মনোরম শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসে লেবু শিউলী আরো কি জানি কোন্ ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে; দোয়েল বুলবুল শিশের ঝঙ্কারে যেন আকাশ বাণীর তারে তারে মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে। হীরক খোলা জান্‌লার দিকে চোখ মেলিয়া আকাশের গায়ে শাদা মেঘের ভেলার দোলা দেখিতে লাগিল, তার মনে হইতেছিল অত ফুলের গন্ধ বুঝি শরতের নিশ্বাস থেকেই আসিতেছে। কিন্তু তখনি তার মনে হইল এই ঘন গন্ধ দূরের নয়, এ যেন তার একেবারে বুকের ভিতরকার নিশ্বাস থেকেই সে পাইতেছে।

সেই দিক হইতে চোখ ফিরাইতেই হীরকের চোখ পড়িল সেবার উপর; সে রমার ছবির সামনে হাঁটু গাড়িয়া উঁচু হইয়া বসিয়াছে এবং ঝুড়ি হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল তুলিয়া তুলিয়া রমার ছবিকে ভূষিত করিতেছে। হীরকের মন রমার জন্য দুঃখে ও সেবার আচরণে আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সে কাতর মুগ্ধ দৃষ্টিতে রমার ছবি ও সেবার উপাসিকার মতন পবিত্র মূর্তি দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তার চোখ দিয়া দুঃখ-আনন্দের অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে যে জাগিয়াছে এ কথা সে সেবাকে জানাইল না; সেবা ছবি সাজাইতেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, সেও হীরকের জাগরণ লক্ষ্য করিল না। সপত্নীর ছবির পুষ্পপ্রসাধন শেষ করিয়া সেবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল হীরক জাগিয়াছে; তার চক্ষে অশ্রুমাখা মুগ্ধদৃষ্টি শিশিরভেজা উষার আলোকের মতন সেবাকে ও রমার ছবিকে দেখিতেছে। সেবা হীরকের সঙ্গে কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার চোখে জল দেখিয়া আর সেবার কথা সরিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হীরকই কথা বলিল—এ কী সেবা?

সেবা ব্যথিত স্বরে বলিল—আজ দিদির শ্রাদ্ধের দিন। পুরুত-ঠাকুর বলছিলেন—অশৌচের মধ্যে অশৌচ হয়েছে, শেষ অশৌচান্ত না হলে কোনো শ্রাদ্ধই হতে পারবে না। আজকের দিনে কোনো রকম শ্রদ্ধা দেখানো হবে না, এ আমার ঠিক মনে হল না।

হীরকের শোকে ও সুখে চোখের জল হু হু করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; তার মনে হইল সেবার উদার চিত্তের মহত্ত্ব। রমা এখন তার সতীন; রমাকে হীরক ভালবাসে বলিয়াই সে সেবাকে বিবাহ করিতে চায় নাই; রমাকে না ভুলিলে হীরকের অন্তরে সেবার স্থান হইবে না; অথচ সেই সেবা নিজে হাতে রমার ছবি ফুলে সাজাইয়া তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে এবং হীরকের মনের ও চোখের সামনে রমাকে উজ্জ্বল স্পষ্ট করিয়া ধরিতেছে। হীরক মুগ্ধ স্বরে বলিল—রমা বেঁচে থাকতে যদি তুমি আসতে সেবা—তা হলে আমরা তিন-জনেই সুখী হতাম।

সেবা বলিল—তিনি বেঁচে থাকলে ত আমার আসারই কোনো দরকার হত না; কাজেই আমার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সেবার এই কথায় হীরকের মন ভার হইয়া উঠিল; রমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগ্রহ সেবার যে কেন হইল না—এই অন্যায় আচরণে সেবার উপর হীরক মনে মনে বিরক্ত হইল; হীরক চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। সেবা মনে করিল হীরক বোধ হয় রমার কথা মনে করিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে হীরকের আহারের আয়োজন করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেবার এই কথার আঘাত হীরক কয়েকদিন ভুলিতে পারিল না। সে গম্ভীর হইয়াই সেবার সেবা গ্রহণ করিতে লাগিল; সেবা তাকে খাওয়ায়, বই কাগজ পড়িয়া শোনায়, রাত্রে ঘুমাইয়া না পড়া পর্যন্ত তার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দ্যায়; কিন্তু হীরক তার সঙ্গে প্রায়ই কিছুই কথা বলে না, সে খায়

নীরবে, পড়া শোনে নীরবে, সেবা খানিক পড়িয়া যখন জিজ্ঞাসা করে—আর পড়ব কি?—হীরক তখনই বলে—থাক্; সে ঘুম আসিবার আগেই চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার ভান করে; সেবা চলিয়া গেলে তার মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠে, আর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সেবা হীরকের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু এর কারণ যে সে নিজে তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই; সে মনে করিতেছিল—মা ও পত্নীর শোকেই হীরক এমন দুঃখিত হইয়া আছে। কেবল যখন সেবা ডালপালা সুদ্ধ এক পাঁজা ফুল বুকের উপর কাঁধের কাছে ফেলিয়া তার ঘরে আসে তখন সেই ফুলের পাশে একটি বড় ফুলের মতন প্রফুল্ল সেবার মুখখানি দেখিয়া হীরক মুখে না হাসিতে চেষ্টা করিলেও তার চোখ দুটি যে হাসিয়া উঠে তাহা সেবা বেশ বুঝিতে পারে।

এমনি করিয়া সুমতির শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেবা ভোর বেলা উঠিয়া পুরোহিতের নির্দেশ মতো সমস্ত আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইল। এক-একবার সে কাজ করিতেছে আর নিঃশব্দ লঘুপদে আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে হীরকের ঘুম ভাঙিয়াছে কি না। একবার সে ঘরে আসিয়া দেখিল হীরক জাগিয়াছে। সেবা বলিল—আজ মার শ্রাদ্ধ। আমি পুরুত-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরে ম্যানেজার-বাবুকে দিয়ে সব জোগাড় করেছি। এই ঘরের মেজেতে শ্রাদ্ধের জায়গা করব কি?

হীরক বলিল—তাই করো। নইলে আমি ত দেখতে পাব না।

সেবা চাকর-দাসীদের সঙ্গে নিজেও খাটিয়া সত্বর ঘর পরিষ্কার ও শ্রাদ্ধের সমস্ত বস্তু আনিয়া সাজাইয়া ফেলিল। হীরক দেখিয়া আশ্চর্য হইল—সেবা এই কদিনে নিজের ইচ্ছা ও উদ্‌যোগে বড়লোকের শ্রাদ্ধের কোনো উপকরণেরই অভাব রাখে নাই; রূপার ষোড়শ, ভালো খাট বিছানা, জুতা ছাতা, কাপড় গরদ ইত্যাদি সমস্তই সে ম্যানেজারকে দিয়া আনাইয়াছে। সেবার এই কর্মকুশলতা ও আপন

উদ্‌যোগে কর্ম করিবার শক্তি দেখিয়া হীরক খুসী হইয়া উঠিল। হীরক অশ্রুগলিত নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেবাকে অভিনন্দন করিয়া বলিল—তোমার এত গুণ সেবা, মা যদি কিছু দিন বেঁচে থেকে দেখে যেতেন।

সেবার চোখেও জল ঝরিতে লাগিল; সে বলিল—আমি মা পেয়েই মাকে হারালাম; আমি ভালো কোরে মার সেবা করবারও অবসর পেলাম না। আমি একদিনেই তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা জীবনে ত কখনো পাইনি, পরে পাব কিনা জানিনা।

হীরক মাকে অত্যন্ত বেশী ভালোবাসিত; সেবা সেই মার প্রশংসা এমন উচ্ছ্বসিত হইয়া করিল শুনিয়া হীরকের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হীরক আনন্দের আলোকে অশ্রুপূর্ণ চোখ উজ্জ্বল করিয়া সেবাকে বলিল—আমার ত সাধ্য নেই মার শ্রাদ্ধ করি; তুমিই আমাদের মার শ্রাদ্ধ করো—মা স্বর্গ থেকে দেখে সুখী হবেন।

হীরকের এই কথায় সেবাও খুসী হইয়া উঠিল; হীরক যে তাকে আত্মীয় মনে করিতেছে ইহা তার কাছে অপ্রত্যাশিত লাভ বলিয়া মনে হইল।

সুমতির শ্রাদ্ধ হীরকের সামনে বসিয়া সেবাই করিল। তারপর নিমন্ত্রিত গ্রামের লোকদের আহারের তদারক করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল, তখনো সেবার খাইবার অবসর হইল না; সকল ব্যস্ততার মধ্যে সেবা এক একবার ছুটিয়া আসিয়া হীরককে দেখিয়া যাইতেছিল; সে যেন কল্যাণী কর্মকুশলতা, সমস্ত বাড়ী যেন তার অস্তিত্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কোথাও এতটুকু ফাঁক সে পড়িয়া থাকিতে দিতেছিল না।

হীরকের ম্যানেজার সেবার ব্যবস্থায় আনন্দিত হইয়া আনন্দবাবুকে বলিল—আমাদের বৌমা এক আশ্চর্য মেয়ে!

আনন্দবাবু সেবার প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—শিক্ষাতেই মানুষকে পটু করে। শিক্ষার সঙ্গে যদি প্রাণ থাকে তা হলে সোনায় সোহাগা হয়। সেবার সে দুটিই আছে।

সেবা রাত্রে হীরককে যখন খাওয়াইতে আসিল তখন হীরক তাকে জিজ্ঞাসা করিল—সমস্ত দিন ত চর্কীর মতন ঘুরছ দেখছি, তুমি নিজে কিছু খেয়েছ ?

সেবা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—খাব এখন, আগে সব লোকের খাওয়া হয়ে যাক।

হীরক আশ্চর্য হইয়া বলিল—তুমি এখনো কিছুই খাওনি ? এত লোককে নিমন্ত্রণ করলে কে ?

সেবা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আমি। মার শ্রাদ্ধে সমারোহ হবে না এ আমার ভালো লাগেনি। তিনি যে দেশের সকলের মা ছিলেন।

হীরক উত্তরোত্তর সেবার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অনুরাগে আকৃষ্ট হইতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—এখনো কি লোক খেতে বাকী আছে ?

সেবা বলিল—হ্যাঁ, আর অল্পই বাকী আছে। নিমন্ত্রিতদের সব খাওয়ানো হয়ে গেছে, কেবল রবাহূত গরীব যারা অন্য গ্রাম থেকে এসেছে, তাদের খাওয়ালেই হয়।

হীরক বলিল—তা তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা ম্যানেজারবাবুকে বলো কাউকে দিয়ে করাবেন ; না হয় ওদের নগদ পয়সা দিয়ে বিদেয় কোরে দিতে বলো ; তুমি আর খেটো না উপোষ কোরে।

সেবা বলিল—আহা, ওরা গরীব। ওদেরকেই ত আমার বেশী কোরে দেখা উচিত—দুঃখ যে কি তা ত আমি জানি।

সেবার এই কথার পর হীরক আর তাকে নিষেধ করিতে পারিল না। সে বলিল—আচ্ছা, তবে আর দেরী কোরো না, তুমি যাও, ওদের খাইয়ে, তুমি নিজে খেয়ে এসে আমায় খাইয়ে দিয়ো। তোমার খাওয়া না হলে আমি কিছুতেই খাব না।

সেবা হীরকের একগুঁয়ে জেদ চিনিয়া লইয়াছিল ; সে হীরককে খাইবার অনুরোধ না করিয়া বলিল—কিন্তু আপনার খেতে রাত্তির হয়ে যাবে যে।

হীরক বলিল—তা হোক, তা না হলে ত তুমি তাড়াতাড়ি করবে না।

হীরকের এই মমতার পরিচয় সেবার মন স্পর্শ করিল ; সেবা ঘর হইতে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আমি শিগগিরই আসছি।

সেবা কিন্তু কিছুতেই শীঘ্র ফিরিতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত লোককে খাওয়াইয়া, বাড়ীর চাকরদাসীদের খাইতে বসাইয়া সে যখন তাড়াতাড়ি একটু কিছু খাইয়া লইতে বসিল তখন বাজিল দশটা। সেবা তাড়াতাড়ি হাতের খাবার ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং হাতমুখ ধুইয়া কাপড়েই হাত মুছিতে মুছিতে হীরকের ঘরে দৌড়িয়া আসিল। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই সেবা ব্যস্ত স্বরে বলিল—বড় রাত হয়ে গেল।

হীরক জিজ্ঞাসা করিল—তুমি খেয়েছ ?

সেবা হীরকের আহারের আয়োজন করিতে করিতে বলিল—হ্যাঁ এই খেয়েই আসছি।

হীরক সেবার যত্ন করিবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—আমাদের দুঃখ দেখে তুমি এসে কি দুঃখটাই ভোগ করছ ?

হীরকের কুণ্ঠা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সেবা বলিল—আমি ত ঠিক আপনাদের দুঃখ দেখে আসি নি ; এখানে এলে ভালো বাগানের মধ্যে থাকতে পাব আর অনেক ফুল পাব শুনে কেবল সেই আকর্ষণেই আমি এসেছিলাম। আমার জীবনের প্রধান বাসনা পূর্ণ হয়েছে এখানে এসে ; সেই পরম আনন্দের বদলে আপনাকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা ত আমি কর্ত্তব্যবোধে করতে বাধ্য।

সেবার কথা শুনিয়া হীরক গম্ভীর হইয়া উঠিল। সেবা যে কেবল বাগান ও ফুলের লোভেই এখানে আসিয়াছে, তাকে সেবা কর্তব্য-বোধে বাধ্য হইয়া যত্ন করে, প্রাণের টানে নয়, ইহাতে হীরকের মন

অভিমানে ভরিয়া উঠিল ; অপরিচিত লোক যে মমতার আগ্রহ বোধ করিতে পারে না, ইহা ভুলিয়া হীরক ক্ষুন্ন হইল। হীরক বলিল—থাক, আর আমি খাব না।

সেবা ব্যস্ত হইয়া বলিল—কিছুই যে খেলেন না? অসময় হওয়াতে খিদে পোড়ে গেছে। আর একটু খান।

হীরক গম্ভীর হইয়া থাকিয়াই বলিল—আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

সেবা তখন অগত্যা হীরককে খাওয়াইতে নিবৃত্ত হইল এবং তার মুখ ধুইয়া মুছিয়া দিল। সেবা হীরকের বিছানার পাশে চেয়ারে বসিয়া বলিল—আজকে কি পড়ব?

হীরক বলিল—আজ আর কিছু পড়তে হবে না। আমার ঘুম পেয়েছে।

সেবা বলিল—আচ্ছা, আপনি ঘুমুন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

হীরকের তখন সেবার উপর অভিমানে রমার অভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তার কেবলি কান্না আসিতেছিল। সে সেবাকে শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য কষ্টে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল এবং একটু পরেই সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া সেবাকে জানাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে সে ঘুমাইয়াছে। সেবা হীরকের ছলনায় ভুলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, সমস্ত দিনের শ্রমশিথিল দেহ তখন বিশ্রামের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, ঘুমে তার দু-চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। সেবা ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে স্থির করিয়া জানিয়া লইয়াই হীরকের কান্না লকগেট-খোলা-পাওয়া বন্যা-স্রোতের মতন তার দুই চোখের পাতা ঠেলিয়া তার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া গড়াইয়া পড়িল।

সেবা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল এবং বিছানায় গা মেলিতে না মেলিতে গাঢ় ঘুমে অচেতন হইয়া গেল।

লোকনাথ খাইয়া আসিয়া যখন হীরকের ঘরের দরজার কাছে বাহিরের দালানে নিজের বিছানা পাতিতেছিল, তখন হীরকের ব্যাকুল কান্নার শব্দ তার কানে গেল। সে চকিত হইয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল; হাতের বিছানা হাতে ধরিয়াই, সে যেমন নুইয়া দাঁড়াইয়া বিছানা পাতিতেছিল তেমনি অবস্থাতেই নিশ্চল হইয়া গিয়া একবার কান পাতিয়া শুনিল; তারপর হাতের বিছানা ফেলিয়া দিয়া একবার উঁকি মারিয়া ঘরের মধ্যে দেখিল; তারপর আস্তে আস্তে গিয়া কামিনী ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কামিনী, বৌমা কি ঘুমিয়েছেন?

কামিনী জাঁতিতে সুপারি কুচাইয়া পানে দিতে দিতে বলিল—বৌমা ত এই গিয়ে শুলেন, বোধ হয় এখনো ঘুমোননি। কেন?

লোকনাথ বলিল—খোকাবাবু বড় কাঁদছে। বৌমা কাছে গেলে শিগগির চুপ করত।

কামিনী পানের খিলি করিয়া আলগোছে টপ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল, এবং হাতের উল্টা পিঠ দিয়া খিলিটাকে মুখবিবরে ঠেলিয়া দিয়া ভরা মুখের ভারীস্বরে বলিল—আচ্ছা, আমি বৌমাকে বলছি।

কামিনী সেবার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বৌমা বড্ড ঘুমুচ্ছে; ডেকে সাড়া পেলাম না।

লোকনাথ মুখ বিষণ্ণ করিয়া নীরবে সেখান হইতে চলিয়া গেল। হীরকের ঘরের দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল হীরক তখনও কাঁদিতেছে। তখন লোকনাথ আবার কামিনীর কাছে ফিরিয়া আসিল। কামিনী তখন ভাঁড়ার-ঘর বন্ধ করিয়া সেবার ঘরে শুইতে যাইতেছিল। লোকনাথ বলিল—কামিনী, বৌমাকে জাগাও, খোকা-বাবু এখনো কাঁদছে।

কামিনী লোকনাথের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল লোকনাথের চোখে জল চকচক করিতেছে। কামিনী আর কিছু না বলিয়া সেবাকে জাগাইতে চলিয়া গেল।

যৌবন বয়সের ঘুম স্বভাবতই গাঢ়, তার উপর সমস্ত দিন কঠিন

পরিশ্রমের পর অনেক রাত্রে শুইয়া সেবা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কামিনী অনেক ডাকাডাকি করিয়া সেবার পায়ে হাত দিয়া নাড়া দেওয়াতে সেবার ঘুম ভাঙিয়া গেল ; সে নিদ্রাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কামিনী ?

কামিনী বলিল—বুড়ো খান্‌সামা বলতে এসেছে যে বাবু বড় কাঁদছে।

সেবার মন প্রথমেই বলিয়া উঠিল—আঃ জ্বালালে। তারপর নিজের নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তির চেয়েও হীরকের অসহায় শোকার্ত অবস্থার সহানুভূতি সেবার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল—লোকনাথ-দাদাকে বলোগে আমি যাচ্ছি।

সেবা তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া একটা জামা টানিয়া গায়ে দিতে দিতে হীরকের কাছে গেল। ঘরে পায়ের শব্দ শুনিয়া হীরক অশ্রুজলের ভিতর দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল সেবা হনহন করিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিতেছে। সেবার কাছে তার গোপন কান্না ধরা পড়িয়া যাওয়াতে লজ্জিত হইয়া হীরক চুপ করিল। হীরক মনে করিল সেবা হয়ত এখনি তাকে তার ছেলেমানুষীর জন্য তিরস্কার করিবে। কিন্তু সেবা একটিও অনুযোগের কথা না বলিয়া তোয়ালে তুলিয়া হীরকের চোখ মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। হীরক চুপ করিয়াছে দেখিয়া সেবা হীরকের পাশে বিছানায় বসিয়া কোমল স্বরে বলিল—ঘুম আসছে না ? তা হলে আমি কিছু পড়ি, শুনতে শুনতে আপনার ঘুম আসবে।

সেবার এই অসাময়িক প্রস্তাব হীরকের মোটেই মনঃপূত হইল না ; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল বলিয়া প্রতিবাদও করিল না। সেবা হীরকের খাটের পাশের শেল্‌ফ্‌ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া একটি স্থান পড়িতে লাগিল—

"কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে, কত হবে,
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত ?
আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি ;
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ !
শূন্য পড়ে আছে দেহ, নাই কেহ নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ ।
সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ,—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে ?"

সেবার মিষ্ট স্বরের উৎকৃষ্ট আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে হীরকের দৃষ্টি সন্তোষে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল ; সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—সেবা, এমনি কবিতা আরো পড়ো, আরো পড়ো ।

সেবা আবার পড়িতে লাগিল—

"হে লক্ষ্মী তোমার আজি নাই অন্তঃপুর !
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদলদলে ।"

সেবার পড়ায় বাধা দিয়া হীরক বলিয়া উঠিল – সেবা, তুমি গান গাইতে পারো ?

সেবা এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের সঙ্কোচের লজ্জা দমন করিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল—পারি ।

হীরক বলিল—তবে তুমি গান গাও, আমি শুনি,—খুব দুঃখের গান, খুব শোকের গান, যা জানো গাও তুমি ।

সেবা উঠিয়া গিয়া হার্‌মোনিয়মের সামনে বসিয়া মিষ্ট সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল—

"সকলি ফুরাল স্বপন-প্রায়।
কোথা সে লুকাল কোথা সে হায়!
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,   পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
ও সব হেরি শূন্যময়, কোথা সে হায়!"

সেবার কণ্ঠস্বর যেন মর্ত্যমানুষের নয়, যেন অশরীরী দিব্য সঙ্গীত লোকলোকান্তর হইতে ভাসিয়া বহিয়া আসিতেছে। হীরক বিস্ময়ে প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া নীরবে শুনিতে লাগিল; সেবা গানের পর গান গাহিয়া চলিতে লাগিল। এই মিষ্ট মধুর সুরের সঙ্গীতে যে মাদকতা ছিল তাতে অভিভূত আচ্ছন্ন হইয়া হীরক কখন্ যে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সেবা টের পায় নাই। অনেকক্ষণ গান করিয়া ক্লান্ত অবসন্ন সেবা যখন একবার দম লইবার জন্য থামিয়া হীরকের দিকে দেখিল তখন সেবার সন্দেহ হইল হীরক বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে আস্তে সন্তর্পণে টুল হইতে উঠিয়া আসিয়া হীরকের বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিল হীরক বাস্তবিকই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হীরকের ঘুম একটু পাকিয়া গাঢ় হইলে যাইবে স্থির করিয়া হীরকের বিছানার এক পাশে বসিয়া সেবা হীরকের মাথায় লঘু স্পর্শে আঙুল বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু ক্লান্তিতে অবসন্ন সেবা একটু পরেই ঘুমে ঢুলিতে লাগিল; তারও চেতনা আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এক সময় হঠাৎ বহু পক্ষীর কাকলিঝঙ্কারে চমৎকৃত হইয়া সেবার ঘুম যখন ভাঙিয়া গেল তখন সে তাড়াতাড়ি চোখ চাহিয়া দেখিল—ঘরের মধ্যে ঊষার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, হীরক জাগিয়া তার দিকে তাকাইয়া আছে, এবং সে কখন হীরকেরই পাশে হীরকের বিছানায় ঘুমের ঘোরে শুইয়া পড়িয়াছিল, এখনও সে হীরকের পাশেই শুইয়া আছে। সেবা লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া হীরকের খাট হইতে নামিয়া পড়িল। হীরকের দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটিয়া আছে দেখিয়া সেবা আরো সঙ্কুচিত

হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কোনো কথাই সে বলিতে পারিল না, হীরকও কথা বলিয়া তার সঙ্কোচ ও লজ্জা লঘু করিয়া দিল না। সেবা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল দরজার কাছে লোকনাথ আনন্দিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সেবা তাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, লোকনাথ প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা, খোকা-বাবুর ঘুম ভেঙেছে ?

সেবা অকস্মাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল ; সে মুখ না ফিরাইয়াই চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—হ্যাঁ।

॥ ১৩ ॥

হীরকের বিছানায় হীরকের পাশে নিজের অলক্ষিতে কেবল ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমাইয়া পড়াতে সেবা যেমন লজ্জিত হইয়াছিল তেমনি তার মনে একটা অনির্বচনীয় ও অনাস্বাদিতপূর্ব পুলক সে অনুভব করিতেছিল। সেবা এ নূতন অভিজ্ঞতার লজ্জায় হীরকের কাছে একটা নূতন সঙ্কোচ ও ব্রীড়া অনুভব করিতেছিল। সে এই লজ্জা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আরও বেশী সঙ্কুচিত হইতেছিল ; নববধূর যে লজ্জার কথা সে সাহিত্যের মধ্যে পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিত আজ সেই লজ্জা নিজে অনুভব করিয়া তার মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুরুষের জন্য নারীর ও নারীর জন্য পুরুষের যে ব্যাকুলতা ও তাদের মিলনের যে আনন্দ এতদিন কেবল সাহিত্যের রাজ্যে কল্পনার সামগ্রী হইয়া ছিল, তাহা আজ অকস্মাৎ নিজের অন্তরে অনুভবের আয়ত্ত দেখিয়া সেবা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তার এই আনন্দ ও লজ্জার মিশ্র আভা তার মুখে পড়িয়া তাকে অধিকতর সুন্দর মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। সে এই আনন্দ বহন করিয়া যতবার হীরকের কাছে যাইতেছিল ততবারই তার মনে হইতেছিল হয়ত বা

তার মন ছাপাইয়া তার পুলকের আতিশয্য হীরকের কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে ; এবং সেই জন্য সে অধিকতর লজ্জায় ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছিল।

হীরক সেবার এই লজ্জার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিতেছিল এবং সেইজন্য সে বেশী করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তার সন্দেহ হইতেছিল সেবা ইচ্ছা করিয়াই রমার সিংহাসনে নিজের স্থান করিয়া লইবার সচেতন চেষ্টা করিতেছে। রামচন্দ্রের পরিত্যক্ত সিংহাসনে ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা প্রতিষ্ঠা করিয়া চৌদ্দ বৎসর রামের সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, হীরকও তেমনি রমার পরিত্যক্ত হৃদয়-সিংহাসনে রমার স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তার সঙ্গে পরলোকে পুনর্মিলনের প্রত্যাশায় দিন গণিতেছে। এর মধ্যে কোথা হইতে সেবা আসিয়া পড়িয়া তার মনে সিঁদ কাটিবার চেষ্টা করিতেছে ; ইহাতে হীরক সর্বনাশের আশঙ্কায় সেবার সকল আচরণ চোরের শঠতা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল। হীরক সঙ্কল্প করিল—সেবার ধূর্ততায় সে কিছুতেই নিজেকে ঠকিয়া যাইতে দিবে না, সেবাকে আর কিছুতেই সে নিজের মনে আমল পাইতে দিবে না, সে সতর্ক হইয়া সেবাকে ও নিজের মনকে পাহারা দিবে।

হীরক যখন মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিতেছিল, ঠিক সেই সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিল লোকনাথ। হীরকের কেমন মনে হইল লোকনাথের মুখে একটা যেন কি গোপনতার প্রয়াস ফুটিয়া উঠিয়াছে। হীরক উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি রে লোকাদা ?

লোকনাথ কেমন একটু থতমত খাইয়া বলিল—"কিছু না ভাই।" কিন্তু সে যে কিছু গোপন করিতে চাহিতেছে তাহা তার ভাবে বোঝা গেল, অথচ তার চোখ-দুটা আবার কৌতুকের আনন্দে জ্বলজ্বল করিয়াও উঠিল।

হীরকের অত্যন্ত রাগ হইল সেবার উপর। সে বাড়ীর চাকর দাসীদের হাত করিয়া লইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা যে কিছু ষড়যন্ত্র

করিতেছে তাতে হীরকের আর সন্দেহমাত্র রহিল না। কিন্তু তার পুরাতন ভৃত্য লোকনাথও যে নবাগত স্বার্থ-বশ সুখান্বেষী সেবার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাকে প্রতারণা করিতেছে ইহা হীরকের সবচেয়ে অসহ্য বোধ হইল, রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। লোকনাথ যে তাকে লুকাইয়া কি করিতে যাইতেছে তাহা ধরিবার জন্য হীরক অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া আড়চোখে লোকনাথকে একএকবার একটু-একটু দেখিতে লাগিল। হীরক দেখিতে লাগিল লোকনাথ দেওয়ালের কাছে দাঁড় করানো যে শেল্‌ফ্‌ ছিল তার উপকার জিনিসগুলি এটা ওটা নাড়িয়া সরাইয়া রাখিতেছে; কিন্তু সেই জিনিস নাড়াচাড়া যে তার আবশ্যক নয় ও উদ্দেশ্যও নয় তা তার হাতের উৎসাহহীন রকম দেখিয়াই হীরক বুঝিতে পারিতেছিল, তার উপর আবার সে মাঝে মাঝে আড়চোখে হীরককে দেখিতেছিল বলিয়াই হীরক বুঝিতে পারিতে ছিল লোকনাথ তাকে লুকাইয়া কিছু করিতে আসিয়াছে, এবং শেল্‌ফের জিনিস গোছানোটা কেবল ছল মাত্র। হীরক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানাইবার জন্য আস্তে আস্তে চোখ বুজিল এবং চোখের পাতা দুটির মাঝে রেখা মাত্র ফাঁক রাখিয়া লোকনাথের আচরণ দেখিতে লাগিল। লোকনাথ দু'বার আড়চোখে হীরককে দেখিল; হীরক চোখ বুজিয়া আছে মনে হওয়াতে একবার সে চট করিয়া ঘাড় অল্প একটু ফিরাইরা ভালো করিয়া আর একবার হীরককে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া লইল; তারপর ক্ষিপ্রহাতে সন্তর্পণে দেয়াল হইতে রমার ফটোগ্রাফখানা খুলিয়া নামাইয়া লইয়া নিজের শরীর দিয়া আড়াল করিয়া ধরিয়া চোরের মতন চুপিচুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল। ইহা দেখিয়াই হীরকের মনে হইল রমার ছায়াটুকুকেও সেবা তার চোখের সামনে হইতে সরাইয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, আর সেই দুরভিসন্ধির উত্তরসাধক হইয়াছে কিনা লোকনাথ! রাগে আত্মহারা হইয়া আবেগের আতিশয্যে হীরক একেবারে উঠিয়া বসিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিল—"শূয়ার কাঁহাকা!" এবং চাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হীরক খাটের পাশের টুলের উপর হইতে একটা রূপার গেলাস তুলিয়া লইয়া লোকনাথের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। লোকনাথ হীরকের বিকৃত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; রূপার গেলাসটা গিয়া তার কপালে লাগিয়া মার্বেল-পাথরের মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বিষম ঝঞ্ঝনায় সমস্ত বাড়ী একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। লোকনাথের কপাল রূপার গেলাসের কানায় কাটিয়া গিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছিল; কিন্তু সে ওদিকে লক্ষ্য না করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসিভরা প্রফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিল—তুমি উঠে বোসে গেলাস ছুঁড়ে আমায় মারতে পেরেছ ভাই!

হীরকের চীৎকার ও গেলাস আছড়ানোর বিকট শব্দ শুনিয়া সেবা কামিনী ও বাড়ীর অন্যান্য চাকর দাসীরা ছুটিয়া আসিয়াছিল। তারা দেখিয়া আশ্চর্য ও আনন্দিত হইল যে হীরক বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আছে। এবং লোকনাথ নিজের রক্তধারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধ আনন্দিত দৃষ্টিতে হীরকের দিকে স্নেহাকুল হইয়া দেখিতে দেখিতে বলিতেছে—তুমি উঠে বসে গেলাস ছুঁড়ে আমায় মারতে পেরেছ ভাই!

হীরক যে উঠিয়া বসিয়া লোকনাথকে মারিতে পারিয়াছে এতেই লোকনাথের অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও লোকনাথের কপাল হইতে রক্ত পড়িতে দেখিয়া হীরক লজ্জিত হইয়া পড়িল; সে যে উঠিয়া বসিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে বিলম্বিত করিয়া তুলিল ইহাতেও হীরকের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইল; সে যে সুস্থ হইয়া উঠিয়া রমার কাছে অবিশ্বাসী ও অপরাধী হইয়া উঠিল এই ধারণাতেও সে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া পড়িল; তার মনে হইল সে-ই যখন রমার কাছে এমন অবিশ্বাসী হইয়া পড়িল তখন লোকনাথ ও সেবা হইলে এতে আর আশ্চর্য কি? তাদের একজন ত অশিক্ষিত ছোটলোক চাকর মাত্র, আর অপরজন ত রমার একেবারে অপরিচিত। হীরক রাগ

ভুলিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে লোকনাথকে বলিল—তুই রমার ছবি চুরি কোরে নিয়ে যাচ্ছিলি কেন? তাইতেই ত আমার রাগ হল, আমি তোকে মারলাম।

লোকনাথ হীরকের এই কথার উত্তরে কেবল সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া এখন খুসীর হাসি হাসিল যেন তার কোনো মহৎ সাধুকর্মের সে প্রশংসা ও পুরস্কার পাইতেছে; তার চুরি যেন গৌরবের, এবং হীরকের হাতের মারে রক্তপাত যেন তার জীবনের চরম পুরস্কার!

সেবা আগাইয়া হীরকের কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল—ও ছবি আমিই চুরি করতে পাঠিয়েছিলাম; কলকাতা থেকে একজন খুব ভালো চিত্রকর আনিয়েছি, তাকে দিয়ে মার আর দিদির অয়েল-পেন্টিং করিয়ে আপনাকে হঠাৎ দেখিয়ে খুসী কোরে তুলব মনে কোরে এখন আপনাকে বলবার ইচ্ছে ছিল না।

হীরক সেবাকে এবং লোকনাথকে মিথ্যা সন্দেহ করার লজ্জায় ও সেবার অন্তরের নূতন পরিচয় লাভের আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে যাইতেছিল; সেবা চট করিয়া নিজের বাহুবেষ্টনে হীরককে ধরিয়া শুইতে না দিয়া প্রফুল্লমুখে স্নেহ-ব্যগ্র অনুরোধের স্বরে বলিল—উঠে যদি বসেছেন ত আর শোবেন না লক্ষ্মীটি। আমি ইন্‌ভ্যালিড-চেয়ার আনিয়ে রেখেছি; তাইতে আপনি বসুন, আমরা আপনাকে নিয়ে একবার বাগানে বেড়িয়ে আসি।

সেবার মধ্যে এখন সেবার শক্তি আছে! হীরক সুস্থ হইয়া উঠিবে নিশ্চয় জানিয়া সে হীরকের সুবিধার জন্য ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারও আনাইয়া রাখিয়াছে! এত মমতা ও এত বুদ্ধি সেবার! হীরক শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে আপত্তি করিবে কিনা ভাবিয়া স্থির করিবার আগেই লোকনাথ চাকা দেওয়া হেলানো চেয়ার ঠেলিয়া লইয়া ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাকে আরাম দিয়া সুস্থ করিয়া তুলিবার এই আয়োজন ও আগ্রহ দেখিয়া হীরক এমন অভিভূত

হইয়া পড়িয়াছিল যে সে আর আপত্তি করিতে পারিল না। সেবা চাকরদের সঙ্গে ধরাধরি করিয়া হীরককে খাট হইতে নামাইয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল এবং তার পিঠে নরম কুশন বালিশ গুঁজিয়া দিয়া ও তার পায়ের উপর একখানি নরম বালাপোষ ঢাকা দিয়া নিজেই সে চেয়ার ঠেলিয়া লইয়া চলিল। হীরক ব্যস্ত হইয়া বলিল—তুমি কেন কষ্ট করছ, চাকরদের কাউকে দাও না।

সেবা ছলছল চোখে ধরা গলায় বলিল—মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনাকে আমি ভালো কোরে তুলব; মা যদি আজ থাকতেন তা হলে আপনাকে উঠে বসতে দেখে তিনিও ভালো হয়ে উঠতেন।

হীরকের তখনি মনে হইল—আর আজ রমাও যদি থাকত!

সেবা হীরকের চেয়ার ঠেলিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত লইয়া আসিল। তারপর চাকরেরা ধরাধরি করিয়া হীরককে নীচে নামাইয়া লইয়া গেল।

হীরক বাগানের মধ্যে গিয়াই দেখিতে পাইল—যে বাগান দেখিয়া গিয়া সে শয্যাগত হইয়াছিল, এ সে বাগান মোটেই নয়। বাগানের শ্রী একেবারে বদল হইয়া গিয়াছে; কত নূতন নক্সার কেয়ারীতে কেয়ারীতে মর্সুমী ফুল; এক এক পথের দুধারে এক এক রকম ফুলগাছের সারের বীথিকা; বাগানের মাঝে দুটি চৌবাচ্চার মতন ছোট্ট ছোট্ট পুষ্করিণী খোঁড়া হইয়াছে, এবং তার একটিতে শাদা লাল নীল রঙের কুমুদ নীল হেলা ফুল ও অপরটিতে শাদা ও লাল পদ্ম ফুটিয়া শারদলক্ষ্মীর হাসিমুখের মত সমস্ত বাগানটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে; বড় পুকুরটিতে শরতের শুভ্র হাস্যের মতন কতকগুলি রাজহাঁস লম্বা লম্বা গলা বাঁকাইয়া পালতোলা নৌকার মতন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি পথের দুধারে কেবল শিউলিগাছ বসানো হইয়াছে; গাছগুলি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, গাছের তলাতেও ফুলশয্যা পাতা। একটি পথের দুধারে

কেবল কদমগাছ ; একটি পথের তুধারে কেবল কৃষ্ণচূড়া। এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুল ফুটিলে পথের তরুবীথিগুলি মনোরম হইয়া উঠিবে। ইহা অনুভব করিয়া ও দেখিয়া হীরকের মনে পড়িল—সে বইএ পড়িয়াছে জাপানে এমনি পথের তুধারে চেরি ও প্লাম গাছের বীথি থাকে ; যখন যে ঋতুতে যে ফুল ফোটে তখন সেই পথ পুষ্পপ্রিয় তীর্থযাত্রীতে ভরিয়া ওঠে। সেই সুদূর দেশের যে শোভা সে কল্পনায় অনুভব করিত তাহা তার বাগানের মধ্যে ধরিয়া দেখাইবার আয়োজন করিয়াছে সেবা ! হীরক পুলকিত হইয়া দেখিতে লাগিল—

"চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে !"

সেবা নিজেই হীরকের চাকা দেওয়া চেয়ার ঠেলিয়া বাগানের চারিদিকে লইয়া বেড়াইতেছিল ; হীরক নীরবে সেবার নিপুণতা ও কৃতিত্ব উপভোগ করিতে করিতে সেবার দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া মুগ্ধ মনের উচ্ছ্বসিত আনন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিল—তুমিই নিশ্চয় এসব করিয়েছ সেবা ! সমস্ত দিন ত তুমি আমার কাছেই থাকতে, এসব করবার সময় পেতে কোথায় ?

সেবা মৃত্থ হাসিয়া বলিল—বাগানের চেয়ে প্রিয় তো আমার কিছুই নেই ; তাই একে আমি মনের মতন কোরে সাজাতে চেষ্টা করেছি—যখনই কাজের মাঝে ফাঁক পেয়েছি তখনই এখানে ছুটে এসে একবার বেড়িয়ে গেছি।

হীরক হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল, বাগানের চেয়ে সেবার আর কিছু যে প্রিয় নয় এই কথা শুনিয়া হীরকের মন যেন তুঃখ অনুভব করিল ; যে বাগান দেখিয়া হীরক এই একটু আগে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বাগানটা তার চক্ষুশূল মনে হইতে লাগিল, জড় বাগানটার উপর কেমন একটা সপত্নহিংসা তার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল ; বাগানটাকে যত তার সুন্দর লাগিতেছিল,

বাগানের মধ্যে যত নূতন পরিবর্তনে সেবার হাতের প্রসাধনের বা মনের আগ্রহের যত্নের পরিচয় পাইতেছিল, হীরক ততই ঈর্ষাকুল হইয়া পড়িতেছিল।

হীরককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবা বলিল—এখন বাড়ী ফিরে যাই ; প্রথম দিনই বেশী বেড়ালে কষ্ট হবে।

হীরক কোন কথাই বলিল না। সেবা হীরককে ফিরাইয়া লইয়া বাড়িতে চলিল। হীরক বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারার আনন্দের উৎসাহের মুখে উপর হইতে নীচে নামিবার অসুবিধা ও কষ্ট গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু এখন মনের অবসাদের অবস্থায় তার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল—চাকরদের কাঁধে চড়িয়া টানা হেঁচড়া সহিয়া তাকে উপরে উঠিতে হইবে। হীরক বিরক্ত স্বরে বলিল—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি সেবা ! আমায় টেনে নামিয়ে আনলে, আবার টেনে ওপরে তুলবে—এমন টানা-হেঁচড়া আমার ভাল লাগছে না একটুও !

সেবা হাসিমুখে বলিল—আর টানা-হেঁচড়া করবার দরকার হবে না। যতদিন আপনি নিজে হেঁটে ওপরে না উঠবেন ততদিন আপনাকে ওপরে তুলব না।

হীরক বিরক্ত স্বরেই বলিল—তবে থাকব কোন চুলোয় ?

সেবা কৌতুকভরা স্বরে বলিল—চলুন না দেখবেন।

সেবার কথায় হীরকও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া রহিল। হীরক বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল বাড়ি নিচের তলায় দালান হইতে যে সিঁড়ি বাগানে নামিয়া আসিয়াছে, তারই একপাশে একটা খুব ঢালু পথ বাঁধানো হইয়াছে ; সেবা সেই পথ দিয়া অনায়াসে ও হীরকের অক্লেশে গাড়ী ঠেলিয়া দালানে তুলিল। এই বিস্ময় না জানি আরো কি বিস্ময়ের অগ্রদূত তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া হীরক নীরবে কৌতূহলী দৃষ্টি চারিদিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সেবা তার গাড়ী ঠেলিয়া

নীচের তলার মাঝখানের বড় ঘরটিতে লইয়া আসিল। হীরক বিস্মিত নেত্রে দেখিল সেই ঘরটি শয়নকক্ষ করিয়া পরিপাটিরূপে সাজানো হইয়াছে এবং সেই নীচের ঘরে বাস করিবার উপযুক্ত সমস্ত আয়োজনই আশে পাশে চারিদিকে করা হইয়াছে। হীরক আশ্চর্য ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত সব জোগাড় কবেই বা করলে আর কেনই বা করেছ সেবা ?

সেবা বলিল—আপনি ভালো হয়ে উঠলে আপনি যাতে বাগানেরই মধ্যে থাকতে পারেন আর সকাল বিকাল বাগানে বেড়াতে পারেন তার জন্যেই এই ব্যবস্থা করিয়েছি।

সেবার কথায় মনে মনে খুসী হইয়াও হীরক চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু তার মনের খুসী তার চোখ মুখের উজ্জ্বলতা দেখিয়া সেবার অগোচর রহিল না। সেবাও প্রফুল্ল মুখে হীরককে চেয়ার হইতে চাকরদের সঙ্গে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া ঢাকা দিতে লাগিল। হীরক বিছানায় শুইয়াই দেখিল তার বিছানার কাছেই একটি সুন্দর খাঁচায় দুটি ক্যানারী-পাখী মৃদুমধুর শিষ দিয়া চঞ্চল হইয়া খেলা করিতেছে, আর সেবার দেওয়া দুইটি বাঁশের ফুলদানীতে দুটি ফুলের তোড়া হইতে শোভার আনন্দ ও পুষ্প প্রাণের সুগন্ধ ঘরখানিকে ভরিয়া তুলিয়াছে।

১৪

সেবা দেখিল হীরকের বাগানে নামিয়া বেড়াইতে পারার আনন্দ ও উৎসাহ পরদিন হইতেই হ্রাস পাইতে লাগিল ; সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে চায় না, অনুরোধ করিলে বিরক্ত হয়। তখন সেবা আবার নূতন কোন্ উপায়ে হীরকের মনে আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতে পারিবে তাই ভাবিয়া স্থির করিতে মনকে ব্যাপৃত করিয়া দিল। হঠাৎ তার মনে পড়িল—আনন্দবাবু যেদিন সেবাকে বিবাহ

করিতে হীরককে অনুরোধ করিতে যান, সেদিন হীরক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, আমি আমার সমস্ত জমিদারী রমার নামে মেয়েস্কুল করিবার জন্য দান করিয়া ফেলিব। এখন সেবা যদি এই সৎকর্মের আয়োজন করিতে পারে তবে হয়ত হীরককে উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারিবে। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সেবা একদিন হীরককে বলিল—দেখুন, আপনি ত একলা মানুষ, এতবড় জমিদারীটা নিয়ে করবেন কি ?

একলা মানুষ! কথাটা ঝাঁত করিয়া হীরকের বুকে গিয়া বাজিল। সে অবাক বিস্ময়ে দৃষ্টি ভরিয়া সেবার দিকে চাহিল। সেবা বলিতে লাগিল—আপনার জমিদারী দান কোরে ফেলুন মা আর দিদির নামে; তা থেকে মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলে দেশের মস্ত উপকার করা হবে।

হীরক রাগ করিয়া একদিন নিজে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, সেবা আজ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া তাকে তার ভোলা ইচ্ছা স্মরণ করাইয়া দিল মাত্র; কিন্তু হীরকের আজ এ প্রস্তাব মোটেই ভালো লাগিল না; সেবা যে দেশের উপকার করিতে উপদেশ দিতে আসিয়াছে ইহা হীরকের কাছে কেমন জ্যাঠামি বলিয়া মনে হইল; তার উপর আবার সেবা তাকে বলিল—একলা মানুষ বই ত না। তবে কি সেবা তার সঙ্গে বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতেছে না ? সেবা কি তবে তাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না ? সেবার এই যে সব যত্ন শুশ্রূষা, সে কি পেশাদার ধাত্রীর কেবল কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রথাপালন মাত্র ? হীরকের মন ক্ষোভে দুঃখে বিরক্তিতে সন্দেহে ছাপোছাপো হইয়া উঠিল; সে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না, গম্ভীর স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

হীরককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবা আবার বলিল—আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক; আপনার মাসে পাঁচ-শ টাকা হলেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। আপনার জমিদারীর আয় বছরে প্রায় বত্রিশ হাজার টাকা; আপনার জন্যে বছরে সাত-আট হাজার টাকা

রাখলেও বছরে চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা স্ত্রী-শিক্ষায় ব্যয় হতে পারবে ; নগদে আর কোম্পানীর কাগজের প্রায় দু-লাখ টাকা জোমে আছে, তাই দিয়ে গোড়া-পত্তন, স্কুল বাড়ী ইত্যাদি হতে পারবে।

হীরকের গলা পর্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে কষ্টে কথা উচ্চারণ করিয়া বলিল—তুমি এই অল্প দিনের মধ্যেই আমার পুঁজি-পাটা যেখানে যা আছে তার সব খবর নিয়ে ঢুকেছ দেখছি। স্ত্রীশিক্ষা আর আমার personal খরচের জন্যে ত সব ভাগ বাঁটোয়ারা করে ফেললে। কিন্তু তোমার নিজের ত কোনো ব্যবস্থা করলে না ?

হীরকের কথার ধরণে সেবার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল ; তার মনে হইল সে বলে—'আমি ত আপনার স্ত্রী, আমার ব্যবস্থা করবেন আপনি।' কিন্তু হীরকের মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী তাকে এ কথা বলিতে দিল না, সে ঢোঁক গিলিয়া নিজের ভাববিলাসিতার ক্ষণিক ইচ্ছা দমন করিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—আমার ব্যবস্থা কি আর আমি করিনি ভাবছেন ? মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর, নিজের ভাবনা সে সবার আগে ভাবে। মেয়েস্কুলে ত শিক্ষয়িত্রীর দরকার হবেই, তারই একটা চাকরী আমায় দেবেন।

চট করিয়া এই কথা বলিতে জোগাইল বলিয়া সেবা নিজের উপর খুসী হইয়া উঠিল, এবং সেই সন্তোষে তার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হীরক কিন্তু বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া পড়িল, সেবা যে তার কাছে চাকরী করিতেছে এবং চাকরীই করিবে মনে করিতেছে, ইহা হীরকের মনে আঘাত করিল। হীরক অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—আচ্ছা, ম্যানেজার বাবুকে বল্‌ব একটা দানপত্র উকিলকে দিয়ে তৈরী করতে।

সেবা আনন্দিত হইয়া বলিল—আমি একটা তৈরী করিয়ে রেখেছি। দেখবেন ?

হীরক সেবার এই অতি আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল ; তার মনে হইল সেবা যেন তাড়াতাড়ি জেদ করিয়া

তার সমস্ত সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করিতে যাইতেছে। হীরক বিরক্তি চাপিয়া বলিল—দেখি।

সেবা তাড়াতাড়ি একটা দলিল বাহির করিয়া আনিয়া হীরকের হাতে দিল; হীরক সেবার কর্মের সম্পূর্ণতা ও তৎপরতা দেখিয়া যত আশ্চর্য হইতেছিল, তত তার মন বিরক্তও হইয়া উঠিতেছিল; হীরক আশ্চর্য ও বিরক্ত হইয়া দেখিল একেবারে স্ট্যাম্প-কাগজে পাকা দলিল লেখা প্রস্তুত হইয়া আছে, কেবল দাতা ও সাক্ষীদের সই করিতে মাত্র বাকী। হীরক নিজের অজ্ঞাত এই দানপত্রে কিসের জন্য কি করিবার উদ্দেশ্যে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় তার সর্বস্ব দান করিয়া দিতেছে তাহা অতি আগ্রহে পড়িয়া দেখিতে লাগিল—সে স্বর্গীয় মাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য সুমতি মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ও ঐ বিদ্যালয় হইতে যে সব মেয়ে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুবিধা হইবে বলিয়া পরলোকগত পত্নী রমার নামে বৃত্তি প্রদানের জন্য নিজের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করিতেছে। কেবল সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে এই বাগান বাড়িতে তার সম্পূর্ণ দখল ও অধিকার থাকিবে এবং তার নিজের খরচের জন্য মাসে মাসে পাঁচশত টাকা সে মাসহারা পাইবে; তার মৃত্যুর পর এই বাড়ি ও টাকাও উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পত্তি হইবে, এবং রমা-বৃত্তি প্রাপ্ত কোনো মেয়ে এখানকার উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদেশে বিদ্যা-সম্পূর্ণ করিতে যাইতে প্রস্তুত হইলে সেই টাকা হইতে তাকে হীরক-বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই দানের ট্রাস্টী হইবে তিনজন—দাতা হীরক নিজে, আনন্দবাবু, এবং সেবা; এই তিনজনের মধ্যে কারো মৃত্যু হইলে অপর দুজন একমত হইয়া অপর কাহাকেও তৃতীয় ট্রাস্টী নির্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। হীরক তার অজ্ঞাতসারে এমন আটঘাট বাঁধা দানপত্র প্রস্তুত হইয়া আছে দেখিয়া এমন চটিয়া গিয়াছিল যে সে লক্ষ্যই করিল না সেবা নিজের জন্য হীরকের সম্পত্তি হইতে এক পয়সা পাইবারও ব্যবস্থা রাখে নাই;

হীরকের মনে হইল সেবাই সমস্ত সম্পত্তিটা ঠকাইয়া নিজে দখল করিবার জন্যই এই ফন্দি আঁটিয়াছে। সেবার ফাঁকি যে হীরকের পরলোকগত মা ও স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার মুখোস পরিয়া হীরককে ঠকাইতে আসিয়াছে এতেই হীরকের আরো বেশী রাগ ও ঘৃণা হইতেছিল। সে ঘৃণার তলায় রাগ চাপা দিয়া বলিল—কাকে কাকে সাক্ষী করবে ডেকে আনো, আমি যদি লিখতে পারি ত এখনি সই কোরে দিচ্ছি, পরে রেজেস্টারী কোরেও দেবো।

এত সহজে হীরককে সম্মত হইতে দেখিয়া সেবা উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আমি দাদামশায়কে গিয়ে বলছি।

সেবা আনন্দ-চঞ্চল পদে ঘর হইতে প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল; সেবার প্রফুল্লতা ও উৎসাহ দেখিয়া হীরকের সন্দেহ আরো ঘন হইয়া উঠিল, সে সমস্ত সংসারটার উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল।

আনন্দবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেবা ফিরিয়া আসিল। আনন্দবাবুকে দেখিয়াই হীরক বলিয়া উঠিল—আমি সর্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞ করছি জ্যাঠামশায়। সেবা আমার পুরোহিত।

আনন্দবাবু হাসিমুখে বলিলেন—এ তোমার মতন মহৎপ্রাণ যুবার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে বাবা; তোমার এই আদর্শে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ তোমা হতে মুক্ত হবে। সেবা তোমারই উপযুক্ত সহধর্মিণী!

আনন্দবাবুর কথায় হীরক ও সেবার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—ত্তুজনার মুখে ত্তুই কারণে। আনন্দবাবুর মুখে হীরকের প্রশংসায় ও হীরকের সহধর্মিণী বলিয়া নিজের পরিচয়ে সেবার মুখে হাসি ফুটিয়াছিল; আর হীরক হাসিয়াছিল এই ভাবিয়া যে এই ছদ্মরূপিণী শয়তানীর কুহকে বৃদ্ধ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যুবক হইলেও এই কুহকের মধুর মোহে সে ভোলে নাই। হীরক যে প্রতারিত না হইয়া যেন সে প্রতারিত হইতেছে এই ভাব দেখাইয়া সেবাকেই প্রতারিত করিতে পারিতেছে এই কৌতুকের আনন্দে সে সহজেই

কলম ধরিয়া দানপত্র সই করিয়া দিল, এবং তার সাক্ষী হইল গ্রামের চার-পাঁচজন মাতব্বর ভদ্রলোক।

গ্রাম জুড়িয়া হীরকের এই বয়সে এই মহৎ দানের প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল; খবরের কাগজের মারফতে এই সংবাদ দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া গেল। হীরক খবরের কাগজে নিজের প্রশংসা দেখিয়া আনন্দের চেয়ে কৌতুক অনুভব করিল বেশী। কিন্তু তার মন সেবার উপর বিষ হইয়া উঠিল, সেবাকে দেখিলেই তার মন এমন বিরক্ত হইয়া উঠিত যে সে তখনই স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া পড়িত।

॥ ১৫ ॥

হীরকের গম্ভীর বিরাগ সেবা দু-তিন দিন ধরিতে পারিল না। হীরককে দিয়া এমন একটা মহৎ অনুষ্ঠান করাইবার নিমিত্ত হইতে পারার আনন্দে সেবার মন থই থই করিতেছিল; যে দিন যে কাগজ সে খোলে তাতেই হীরকের প্রশংসা পড়িয়া সেবার মন আত্মপ্রসাদে এমন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল যে তার কাছে বিশ্বনিখিল আনন্দিত মধুময় অভাবশূন্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু তিন চার দিনেই অল্পে অল্পে সেবা অনুভব করিতে লাগিল হীরকের গম্ভীর ভাব ও তার প্রতি হীরকের বিরাগ। আগে হীরক তার আগমনের প্রতীক্ষায় যেমন উৎসুক আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং সে কাছে আসিলেই হীরক যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, এখন আর সে হীরককে তেমন দেখিতে পায় না। সেবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল—তবে হীরকের যত্ন সম্বন্ধে তার কি কোনো ক্রটি ঘটিতেছে? সে ক্রটি সংশোধনের জন্য যত বেশী আগ্রহে যত্ন করিতে লাগিল হীরক ততই মনে করিতে লাগিল—এ যেন জালেপড়া মাছির উপর মাকড়সার যত্ন, সূতার পর সূতা জড়াইয়া তাকে ভালো করিয়া বন্দী করিবার ফন্দী। হীরককে প্রফুল্ল ও সহজ করিয়া তুলিবার সকল রকম চেষ্টা করিয়া বিফল ও

পরাস্ত হইয়া সেবা ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল; সে অনুভব করিতে লাগিল তার মনের চির-প্রফুল্লতা যেন হীরকের অটুট বিরসতার ছোঁয়াচে ম্লান হইয়া আসিতেছে, তার ভরা মনে কিসের অভাব যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। সেবার মনে যেন কান্না চোঁয়াইয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। এ কী তার দুর্দৈব! সে এই কোথাকার কে অপরিচিত লোকটিকে নিজের সর্বস্ব দিয়া নিজের অদৃষ্টকে তার সঙ্গে জড়াইয়া জট পাকাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তার বদলে সে কি কিছুই পাইবার যোগ্য নয়? প্রীতি যদি না পায়, একটু কৃতজ্ঞতার পরিচয়ও ত তার পাওয়া উচিত। কিন্তু হীরক আজকাল তার সেবা লইতেই নিষ্ঠুর রকমের আপত্তি করে; সে কিছু করিতে গেলেই হীরক বাধা দিয়া বলিয়া ওঠে—থাক, ও তোমার করতে হবে না। সে নিজের সমস্ত ভবিষ্যত বাঁধা দিয়া পাইল এই উপেক্ষা ও অবহেলা! এখানে আর তার যদি দরকার না থাকে তবে সে নিজের অদৃষ্টের জট খুলিতে না পারিলেও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু সেই জট ছিঁড়িতে গিয়া হীরকের যদি ক্লেশ হয় একটুও, এই ভয়েই সেবা মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না, অসহ্য সন্তাপে সকলের অগোচরে পুড়িয়া যাইতেছিল। এখন গৃহকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারী এবং নবপ্রবর্তিত মহিলা-বিদ্যালয়ের সকল কর্মেরই তদারক তাকেই করিতে হয়, কিন্তু কোন কাজের মধ্যেই সে আর উৎসাহের উৎস খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

এমনি দুতরফা গোপন দুঃখের বোঝা বহিয়া চারমাস কাটিয়া গেল, ফাল্গুন মাস আসিল। পাতাঝরার সময়। সেবা বাগানের ধারের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া ছাখে চোখের জলের মতন ঝরঝর করিয়া গাছের পাতা খসিয়া বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তার মনে হয় তার চারদিক হইতে সুখের সম্ভাবনা যেন এমনি করিয়াই ঝরিয়া পড়িতেছে। সে নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া দিয়াও যে কেন হীরকের মন পাইতেছিল না,

হীরককে সুখী করিতে পারিতেছিল না, তাহা সে খুঁজিয়াও বুঝিতে পারিতেছিল না বলিয়াই তার নিজের উপর ও হীরকের উপর রাগ হইতেছিল—এক একবার তার মনে হইতেছিল তারই কোনো অজানা ত্রুটিতেই হয়ত হীরক তার উপরে অপ্রসন্ন হইয়া থাকিতেছে, আবার অনেক চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াও সে যখন নিজের কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না তখন সে হীরকের অকারণ গাম্ভীর্য ও বিরাগকে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেমানুষের অন্যায় আব্দার ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিতেছিল না। হীরক এখনো শয্যাগত আছে; সে ইচ্ছা করিলে শয্যা ছাড়িয়া এতদিন উঠিতে পারিত, সে সম্বন্ধে সেবার সন্দেহ নাই; বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া হীরক সেবার সেবা লইতেছে, অথচ তার উপর বিরক্ত অপ্রসন্ন হইয়াও আছে, ইহা সেবার কাছে অত্যন্ত অন্যায় অশোভন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। এই রকম মনের ভাব লইয়া সদানন্দময়ী উল্লাস-চঞ্চল সেবার উৎসাহ যেন শ্লথ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে আর প্রাণের টানের আগ্রহে হীরকের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিতেছিল না, শিক্ষিত সেবিকার কর্তব্য পালন মাত্র যন্ত্রের মতন সে করিয়া চলিতেছিল।

একদিন বিকালে সেবা বাগানের প্রথম বসন্তের দান কতকগুলি সদ্য-মঞ্জুরিত আমের মুকুল নবকিশলয়দল শুদ্ধ তুলিয়া আনিয়া হীরকের বিছানার কাছে ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিতেছিল। সেবার দিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই হীরকের মুখ খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তার মনে হইল—সেবা কবি!—নানান রকম ফুল ত সবাই ফুলদানীতে সাজায় দেখিয়াছি, কিন্তু আমের বোল তুলিয়া ফুলদানী সাজাইতে ত কাউকে দেখি নাই; কবি বিনা এমন সখ কারো হয় না। হীরক হাসিয়া সেবাকে কবি বলিয়া সম্বোধন ও তার রুচির প্রশংসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন চাকর ঘরে আসিয়া সেবার হাতে একটা ভিজিটিং-কার্ড দিয়া বলিল—একজন সাহেব বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

হীরকের ঠোঁটের কথা সেবাকে আর বলা হইল না, তার মুখের হাসির ছটাও বিস্ময়ে বিলীন হইয়া গেল, সে আশ্চর্য ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সাহেব আবার কে? কে আবার জ্বালাতে এল?

সেবা হীরকের দিকে পিছন ফিরিয়া ফুলদানীতে আমের মুকুল সাজাইতেছিল, হীরক গম্ভীর বিরক্ত হইয়া থাকে বলিয়া সে আর আগের মতন সহজে হীরকের দিকে তাকাইতে পারে না, হীরকের সঙ্গে হাসিমুখে অনর্গল গল্প করিতে পারে না। সে হীরকের প্রশ্ন শুনিয়া যখন তার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল তখন সে আর দেখিতে পাইল না, হীরকের মুখের উপর কি আনন্দনিবেদন তার কাছে আত্ম-প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল: সেবা দেখিল শুধু হীরকের চোখে মুখে বিস্ময় ও বিরক্তি। সেবা আনত চোখের দৃষ্টির নীচে হাতের কার্ডখানি পাতিয়া ধরিয়া পড়িতে গেল—ডকটর···

হীরক ঐটুকু শুনিয়াই বিরক্তিকর্কশ কঠোরস্বরে উগ্রভাবে চেঁচাইয়া উঠিল—ডাক্তার! কে তোমাকে গিন্নমো কোরে ডাক্তার ডাকতে বলে? তুমি কি জান না আমার ডাক্তার দেখিয়ে রঙ্গ করবার সখ নেই? শয্যাগতকে শুশ্রূষা করতে আর না পারো কোরো না, আমায় জ্বালিয়ো না।

সেবা তিরস্কারে ব্যথিত বড় বড় দুটি চোখ তুলিয়া হীরকের দিকে কোমলভাবে তাকাইয়া নরম সুরে বলিল—আমি ত ডাক্তার ডাকাই নি; কে ডাকিয়েছেন তাও জানি না। ইনি আই-এম-এস দেখছি, জেলার সিভিল সার্জন হতে পারেন।

অকারণে সেবাকে তিরস্কার করিয়া হীরক অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; সে অপ্রতিভ মুখে সেবাকে বলিল—কি নাম পড়ো ত?

সেবা আবার চোখ নামাইয়া পড়িল—ডকটর কুমুদশঙ্কর···

আর বাকীটুকু না শুনিয়াই হীরক উল্লাসে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া আনন্দ-ব্যগ্র স্বরে বলিয়া উঠিল—আরে তাই আগে বলতে হয়—আমাদের কুমুদ! যা যা সাহেবকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।

হীরকের হুকুম পাইয়া চাকর চলিয়া গেল। সেবাও সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া দরজার দিকে যাইতেছিল। হীরক উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিল—সেবা তুমি যেয়ো না। এ আমাদের কুমুদ!

হীরকের এত আনন্দ হইয়াছিল যে সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে সেবার কাছে 'আমাদের কুমুদ' বলিলেই পর্যাপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল না; তাই সে বারবার শুধু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছিল—এ আমাদের কুমুদ! এর কাছে তোমার লজ্জা করতে হবে না—ও একেবারে আমাদের ঘরের লোক। বাড়ীর লোকের কাছে লজ্জা করলে চলে কখনো···

এমন সময় সেই সাহেবী-পোষাক পরা কুমুদ হাসিতে হাসিতে সেই ঘরে আসিতেছে দেখা গেল; সে চৌকাঠের এপারে পা দিয়াই দুই হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া সেবাকে নমস্কার করিল এবং কাছে আসিতে আসিতেই বলিতে লাগিল—প্রণাম হই বৌদিদি। দোহাই আপনার, ঘরের লোককে দেখে লজ্জা করবেন না, আপনি পালাবেন না। শাস্ত্রের বিধি—কেবল দুর্জন দেখলেই স্থান ত্যাগ করবে।—আমাকে না দেখেই আপনি ঠাওরালেন কি করে যে আমি দুর্জন?

সেবা প্রতিনমস্কার করিয়া কৌতুকপূর্ণ আনন্দিত দৃষ্টিতে কুমুদকে দেখিয়া লইল—লম্বা ফর্সা তরুণ যুবা, ফিটফাট বাবু, চোখে রিমলেস্ প্যাঁশনে চশমা, মাথার চুল কোঁকড়া, ঘি-রঙের ফ্লানেলের স্যুট সদ্য-পাটভাঙা চোস্ত—কোথাও এতটুকু কোঁচকায় নাই, গায়ের রঙে ও পোষাকের রঙে যেন মিলিয়া গিয়াছে, তার চোখ উজ্জ্বল চঞ্চল, মুখ আনন্দিত ও সপ্রতিভ। সেবা হাসিমুখে একখানা চেয়ার হীরকের খাটের কাছে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিল—বসুন।

কুমুদ প্রবল আপত্তিতে জোরে জোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সে হতে পারে না, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বস্‌ব, এ হতেই পারে না।

সেবা কৌতুক-আনন্দে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমিও বস্‌ছি, বসুন আপনি।

কুমুদ আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনি না বস্‌লে আমার বসা হতেই পারে না।

কুমুদকে সেবা যে চেয়ারখানা দিয়াছিল, কুমুদ সেইখানা সেবার কাছে পাতিয়া দিয়া নিজের জন্য আর-একখানা চেয়ার একটু দূর হইতে তুলিয়া আনিল। সেবা লজ্জিত মুখে বসিল। কুমুদও হীরকের হাত নিজের হাতে তুলিয়া চাপিয়া ধরিয়া চেয়ারে বসিল। হীরক হাসিয়া বলিল—তোর কি সব অকস্মাৎ কুমুদ? বিলেত গেলি হঠাৎ কাউকে বলা না, কওয়া না; বিলেত থেকে ফিরলি হঠাৎ; বাড়ীতে ঢুকেই বৌদিদির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলি দিব্যি; আমি যে এতকালের বন্ধু, আমার সঙ্গে কথাই নেই, যত কথা বৌদিদির সঙ্গে! আমি মনে মনে ভেবে রাখছিলাম তোদের ইনট্রোডাকশান করাবার সময় কালিদাসের শ্লোক আওড়ে বলব—ইনি আমার—

গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

আর টেনিসনের লাইন আওড়ে সেবাকে বলব—এই যে আমার বন্ধু, এ—

More than my brothers are to me।—

তা তুই সব ভেস্তে দিয়ে নিজেই বৌদিদি পাতিয়ে আলাপ জুড়ে দিলি দিব্যি।

কুমুদ হাসিতে হাসিতে হীরকের হাত ধরিয়া অল্প অল্প নাড়া দিতে দিতে বলিল—আরে পরের পরিচয় দিয়ে দরকার কি? বৌদিদি যে তোর গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা তা তোর কাছ থেকে না শুনেও আমি বুঝতে পারতাম—এমন বুদ্ধি আমার ঘটে আছে, আর আমি যে তোর কেমন বন্ধু তাও তুই পরিচয় না দিয়ে বৌদিদিকে বুঝতে দিলেই তাঁর বুদ্ধির প্রতি সম্মান দেখানো হত। তা তোর নিজের

বুদ্ধির ওপর এমন মমতা যে আমাদের দুজনের ওপর তোর নিজের এস্টিমেট না চাপিয়ে কিছুতেই ছাড়লি না।

কুমুদের কথা শুনিয়া হীরক পুলকিত হইয়া অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সেবার মুখও আনন্দের আভায় জ্বলজ্বল করিতেছিল নানা কারণে।—প্রথম, বহুদিনের গুমোট গ্রীষ্মের পর আজ যেন বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বহিতেছে মনে হইতেছিল ; হীরক এই চার মাস যে-রকম আড়ষ্ট গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাতে সেবার সকল উৎসাহ আনন্দও যেন জমাট বাঁধিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছিল ; আজ কুমুদের আগমনে হীরকের সেই আড়ষ্ট ভাব ত কাটিয়া গেছেই, তার এমন আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রাণখোলা হাসি সেবা আসিয়া অবধি শুনে নাই। দ্বিতীয়, হীরক আজ নিজের মুখে প্রচার করিয়াছে খুসীতে খোলা মনে যে সেবা তার গৃহিণী সচিব সখী ও শিষ্যা এবং সে তার প্রিয়ও। তৃতীয়, দুই বন্ধুর মিলনের আনন্দ ও কুমুদের সহজ অমায়িক আত্মীয়তা সেবাকে মুগ্ধ করিতেছিল। চতুর্থ, তার আশা হইতেছিল কুমুদের মতন বন্ধুর প্রাণচাঞ্চল্যের সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে পারিলেই হীরক সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে।

হীরক হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, এখন শুনি—তুই কবে এলি, কোথায় পোষ্টেড হলি, কবে জয়েন করতে হবে, কতদিন তুই আমার কাছে থাকবি ?

কুমুদ হাসিয়া বলিল—তোর অত জেরার জবাব দিতে হলে কিছু খেয়ে আগে গায়ে জোর কোরে নিতে হবে। বৌদিদি, বড় খিদে পেয়েছে—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার থেকে কিছু প্রসাদ পেতে চাই।

এই সদ্যপরিচিত বন্ধুকে এমন করিয়া যাচিয়া খাইতে চাহিতে দেখিয়া সেবার যেমন কৌতুক বোধ হইল ; তেমনি তার আনন্দও হইল, আবার একটু লজ্জাও হইল ;—সে মেয়ে—অন্নপূর্ণার স্বজাতি,

তাতে আবার বাড়ীর গৃহিণী, তারই আগে খাইতে অনুরোধ করিবার কথা; কিন্তু সপ্রতিভ কুমুদ তাকে হারাইয়া দিয়া যে জিতিয়া লইল এতে তার লজ্জা আনন্দ কৌতুক তিনই বোধ হইল। সেবা হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া খাবার আনিতে গেল।

সেবা বাহির হইয়া যাইতেই হীরক দুঃখিত হইবার উপক্রম করিয়া আনন্দের উপর যথাসম্ভব শোকের ছায়া টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সব শুনেছিস কি? মা আর রমা আমাকে ছেড়ে গেছে, আর আমি···

কুমুদ চট্ করিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া নিজের উদ্যত দুঃখবেদনাকে চাপিয়া ফেলিয়া হাসিমুখেই বলিতে লাগিল—আরে আমরাই বা আছি কটা দিন? মেরে কেটে আর পঞ্চাশ ষাট বছর? এমন সুন্দর ধরণীতে ঐ কটা দিনে কতটুকু আনন্দই বা সঞ্চয় করব। আনন্দ লুট্‌তেই সময় পাওয়া যায় না, তা দুঃখ শোক করব কখন? যা আছে তার কথা ভাবতেই সময় পাই না, যা নেই তার জন্যে আর ভাবি কখন? যা আছে তাই এত প্রচুর যে যা হারিয়েছে তার জন্যে মন খারাপ করবার কিছু দরকার নেই।—

"থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু!
সেই আনন্দে যাওরে চোলে
কালের পিছু পিছু!
অধিক দিন ত বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ!
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান!
মালা বটে শুকিয়ে মরে।—

যেজন মালা পরে
সেও ত নয় অমর, তবে ?
দুঃখ কিসের তরে ?
থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ
থাক্‌বে না ভাই কিছু
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।"

বৌদিদির ছোট বোন-টোন কেউ আছে বল্‌তে পারিস ?

কুমুদের আনন্দবাদী মনের সংস্পর্শে আসিয়া ও তার মুখের আনন্দ-লঘু কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া হীরকের মনও হাল্কা ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর তার মুখে হঠাৎ এই খাপছাড়া উদ্দেশ্য-শূন্য প্রশ্ন শুনিয়া হীরক কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—তোর বৌদিদির ছোট বোনের খবরে দরকার কি ?

কুমুদ বলিল—বিয়ে করব। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল সে মোরে গেছে, এখন একটা বিয়ে ত করতে হবে। বৌদিদির বোন হলে একেবারে যাচাই করা ভালো মেয়ে পাওয়া যাবে।

হীরক অধিকতর কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তোর বৌদিদির কে আছে না-আছে, কিছুই ত আমি জানি না, আচ্ছা সেবা আসুক, খোঁজ নেওয়া যাবে। কিন্তু তোর আবার কার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, আর কবেই বা সে মর্‌ল ?

কুমুদ হাসিমুখে বলিল—আরে আমার কাছাকাছি বয়সী মেয়ে দুনিয়ায় রোজই ত মরছে ; তাদের কেউ না কেউ ত আমার প্রেয়সী প্রাণেশ্বরী হলেও হতে পারত। সে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় না করেই যে মোরে গেল, তাতে আর কি করছি বল ? তার শোকের ঝাপটায় আনন্দের আলো নিবিয়ে দিয়ে মুখ অন্ধকার কোরে জীবনটাকে ত নষ্ট করতে পারি না !—

"এস আমার শ্রাবণ-নিশি
এস আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এস আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এস, তুমিও এস ;
তুমি এস—এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জানো
ধরণীর নাম মর্ত্যভূমি !
যে যায় চোলে বিরাগ ভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই এমন
সময় যে নেই—সময় যে নেই।"

কুমুদের সান্ত্বনার ইঙ্গিতভরা কৌতুকময় কথায় ও বলিবার ভঙ্গীতে উৎফুল্ল হইয়া হীরক আবার উচ্চস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেবা কুমুদের খাবার লইয়া আসিতে আসিতে হীরকের সেই প্রাণ-খোলা হাসি শুনিয়া খুসী হইয়া প্রফুল্ল মুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সেবা ঘরে ঢুকিতেই হীরক হাসির ভিতর হইতে কথা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেবা, তোমার ছোট বোন আছে ?

সেবা আশ্চর্য ও কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল—না। কেন ?

হীরক বলিল—কুমুদ বিয়ে করত—ওর তোমায় বড় ভাল লেগেছে, তোমায় যখন পাবে না, তখন তোমার অনুকল্প চাই ওর।

সেবার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল ; সেবার লজ্জা দেখিয়া কুমুদও অপ্রতিভ হইল। সেবা আগাইয়া আসিয়া কুমুদের সামনে টেবিলের উপর খাবার রাখিবার সময়টুকুর মধ্যে নিজের লজ্জা সামলাইয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল—আপনি জল খান।

কুমুদ সেবার আহ্বানে চট্ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—আমাকে

আপনি সম্বোধন নয় বৌদিদি—আমি আপনার ছোট দেওর, আপনার ছোট ভাই—শুনলেন ত আপনি হীরকের কাছে যে আপনাকে আমার ভাল লেগেছে—আপনাকে আমার নিজের দিদির মতন বোধ হচ্ছে।

হীরকের কথার মধ্যে যে একটু বিদ্রূপের খোঁচা সবাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, কুমুদ সেই বিদ্রূপকে সত্য বলিয়া সহজে স্বীকার করিয়া সমস্ত লজ্জা দূর করিয়া দিল সেবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অথচ পবিত্র পদবীতে স্থাপন করিয়া এবং তাতেই সবাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। সেবা সহজ হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা তুমি জল খাও।

কুমুদ খাবারের রেকাবি বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডান হাতে খাবার মুখে তুলিতে তুলিতে বলিল—মাপ করবেন বৌদিদি আপনাকে তুবার অনুরোধ করতে হল। আমার এমন তুর্নাম কোথও কখনো নেই যে কুমুদকে উপরোধ কোরে ঢেঁকিও গেলাতে হয়। গেলবার জিনিস আপনিই গেলে। তবে ভরসা এই যে আজও আর তুর্নাম রট্‌বে না, কারণ খাবারটা আমার নিজের যেচে পাওয়া!

কুমুদ সেবার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে হীরকও হাসিতে লাগিল। কুমুদের সদানন্দ মন, হাস্যদীপ্ত মুখ ও অনর্গল কৌতুক-কথা সেবার জীবনের ক্ষণিকের তুঃখছায়া একেবারে দূর করিয়া আবার তাকে আগের মত প্রদীপ্ত শ্রীতে বিমণ্ডিত করিয়া তুলিল।

কুমুদের খাওয়া হইলে হীরক বলিল—সেবা, লোকাদাকে বলো ওপরের ঘরে কুমুদের থাকবার ব্যবস্থা কোরে দেবে। যা, সাহেবী খোলস ছেড়ে আয়, তারপর বাগানে বেড়ানো যাবে।

কুমুদের মুখ বন্ধ ছিল শেষ সন্দেশটি চর্বণে; সে সেটিকে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—আজ ভাই থাকতে পারবো না। আমি যাচ্ছিলাম দিদির সঙ্গে দেখা করতে, সেখান থেকে ফিরে এখানে

আসবো ঠিক ছিল ; কিন্তু তোর স্টেশনে গাড়ী এসে থামলে আর না নেমে থাকতে পারলাম না। আজ না গেলে দিদি ভাববে। পরশু তরশু সেখান থেকে ফিরে এসে কিছুদিন থাকব।

কুমুদ চলিয়া যাইবে শুনিয়া সেবার মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, সে আশা করিয়াছিল কুমুদ থাকিলে হীরক প্রসন্ন প্রফুল্ল হইয়া শীঘ্রই সুস্থ সহজ মানুষ হইয়া উঠিবে, তাতে বিলম্ব ঘটিবে আশঙ্কা করিয়া সেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অনেক কাল বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরছো, আত্মীয়-স্বজন সকলেই দেখতে উৎসুক হয়ে আছেন বুঝতে পারছি ; কিন্তু তবু ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। দুদিন থেকে কি যাওয়া যায় না ?

কুমুদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—না বৌদিদি, দিদিকে আমি চিঠি লিখেছি আজ যাব না গেলে বড় ভাববে। আমি শীগগির ফিরে ত আসছি।

হীরক এতক্ষণ বসিয়াছিল, সে সেবার বিষণ্ণমুখ দেখিয়া ও দীর্ঘ-নিশ্বাস শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—এরকম অন্যায় অনুরোধ করা তোমার উচিত নয় সেবা—কুমুদ এতকাল পরে বাড়ী ফিরল, আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করবে না ?

কুমুদ মনে করিল সে এখনি আসিয়া এখনি চলিয়া যাইতেছে বলিয়া হীরক নিশ্চয় অভিমান করিয়াছে ; সে এক হাত হীরকের কাঁধে রাখিয়াও এক হাতে হীরকের এক হাত তুলিয়া ধরিয়া বলিল—লক্ষ্মী ভাই, রাগ করিস্‌নে। আচ্ছা, আমি কাল হয়ত ছাড়া পাব না, পরশু নিশ্চয় আস্‌ব। তবে এখন যাই ভাই, নইলে ছটার গাড়ী পাব না।

সেবা জিজ্ঞাসা করিল—ছটার গাড়ীতে গেলে কটার সময় পৌছবে সেখানে ?

কুমুদ বলিল—রাত্তির এগারোটা হবে।

সেবা বলিল—তবে দাঁড়াও, সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দি, পৌছুতে অত রাত্তির হবে।

কুমুদ খুসী হইয়া হাসিয়া বলিল—আমার টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু খাবার আছে; তবু দিন কিছু, খাবার প্রত্যাখ্যান করা আমার স্বভাব নয়। আপনার ভাই যে কতবড় পেটুক তা আমার চেয়ে নিয়ে চেটে পুটে খাওয়া দেখেই ত বুঝতে পেরেছেন।

সেবা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। হীরক চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিল। ছেলেমানুষ রাগ করিলে লোকে যেমন করিয়া ভোলায়, কুমুদ তেমনি করিয়া হীরককে বলিতে লাগিল—রাগ করিসনে ভাই, আমি ফিরে এসে অনেকদিন থাকব। যেতে কি আমারই ভালো লাগছে, কিন্তু কি করি···

সেবা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে ত শুধু একটা ব্যাগ আর টিফিন-ক্যারিয়ার ছিল?

কুমুদ হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ছিল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—হ্যাঁ।

সেবা বলিল—আমি গাড়ীতে তুলে দিতে বলেছি, গাড়ী আনতে গেছে।

কুমুদ বলিল—আবার গাড়ী কেন বৌদিদি, এই ত স্টেশন, আমি হেঁটেই চোলে যেতাম।

সেবা বলিল—হেঁটে যেতে হলে আগেই বেরুতে হবে, হাঁটার চেয়ে গাড়ীতে শিগ্‌গির যাওয়া যাবে; যতক্ষণ ধোরে কাছে রাখা যায় ততক্ষণই লাভ।

কুমুদ হাসিতে লাগিল। সেবাও হাসিল।

হীরক মুখ আরো গম্ভীর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

লোকনাথ আসিয়া খবর দিল—মোটর গাড়ী বাগানের গেটে এসেছে।

কুমুদ আবার হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল—তবে আসি ভাই। আমি কাল পরশুই এসে পড়ব।

হীরক কোনো কথা বলিল না। কুমুদ হীরকের হাত নাড়িয়া

মাথার চুলের উপর দিয়া হাত বুলাইয়া ক্রুদ্ধ ব্যথিত বন্ধুকে নীরব সান্ত্বনা জানাইল ; তারপর সেবাকে নমস্কার করিয়া বলিল—তবে আসি বৌদিদি—পুনর্দর্শনায় চ।

সেবা বিষণ্ণ হাসিমুখে বলিল—চলো, তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

হীরকের ঘরের সামনেই বাগান ; সিঁড়ির নীচেই দীর্ঘ সোজা পথ, তরুবীথিকায় সমাচ্ছন্ন ; কুমুদ ও সেবা সিঁড়ি নামিয়া পাশাপাশি সেই পথ দিয়া কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল ; হীরক উৎসুক হইয়া বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া সেই দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। সেবা বাগানে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বন্ধুর জীবনের সব ঘটনা শুনেছ কি তুমি ?

কুমুদ বিষণ্ণ মুখে দুঃখিত স্বরে বলিল—শুনেছি বৌদিদি।

—উনি ডাক্তার দেখাতে চ্যান না, মরবেন বোলে। তুমি ডাক্তার, তুমি কাছে থাকলে উনি সেরে উঠতে পারেন ; তুমি আসতে আহ্লাদে উঠে বসেছিলেন।

—ও ত সেরে গেছে। পক্ষাঘাত বেশীর ভাগ মনের রোগ ; উঠতে পারব না মনে করলেই রোগীর অঙ্গ অবশ বোধ হয়, তা ছাড়া পোড়ে থেকে থেকেও অঙ্গ শিথিল দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি ফিরে এসে ওকে চাঙ্গা কোরে দিয়ে তবে যাব।

—তুমি চোলে যাচ্ছ বোলে রেগেছেন। তুমি দিদির সঙ্গে দেখা সেরে এখানে এলেই ভালো হত।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—তাই দেখছি। ও এখনো ভারী ছেলে-মানুষ আছে—চিরকালের সেন্টিমেণ্টাল।

সেবাও কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিল।

এমনি হীরকের কথা আলোচনা করিতে করিতে তারা গেটের কাছে পৌঁছিল। কুমুদ আবার সেবাকে নমস্কার করিয়া মোটরে চড়িল। মোটর অদৃশ্য হইয়া গেলে সেবা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

সেবা ফিরিতেছে দেখিয়া হীরক টপ করিয়া মাথা নামাইয়া শুইয়া পড়িল। সেবা হীরকের কাছে আসিয়া বলিল—ঠাকুরপো বড় খাসা সরল লোক। এক দিন এক ঘণ্টার আলাপ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত কালের আত্মীয়, চোলে গেলেন ত কষ্ট হচ্ছে।

হীরক অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল, সেবার সঙ্গে কথা কহিল না। সেবা আবার বলিল—এখন একবার উঠে বাগানের দিকে বেড়াতে গেলে হত।

হীরক এ কথাতেও কোনো সায় দিল না। সেবা হীরকের কোনো উত্তর না পাইয়া ব্যথিত চিত্তে একলাই বাগানে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

হীরকের মনে একটা অকারণ ঈর্ষা জাগিয়া তাকে পীড়া দিতেছিল। সেবা আশৈশব মেম-সাহেবদের মধ্যে থাকিয়া পুরুষের সঙ্গে সহজে বন্ধুভাবে মিশিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; কুমুদও সদ্য বিলাতফেরত, সেও মেয়েদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশিতে শিখিয়াছে; কিন্তু হীরক এ-রকম ব্যবহারে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, এরকম অসঙ্কোচ আচরণের সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না। এতদিন সে সেবাকে পত্নীত্বের অধিকার দিতে চায় নাই, তাকে বরাবর দূরে সরাইয়া ফেলিতেই চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আজ আর-একজন পুরুষ তার ও সেবার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেই সেবার উপর তার অধিকারের মমত্ব সজাগ হইয়া উঠিল। হীরকের মনে হইল—সে পীড়িত শয্যাগত পঙ্গু, কুমুদ সুস্থ সবল সুশ্রী; সে শোকার্ত বিষণ্ণ গম্ভীর, কুমুদ প্রফুল্ল আনন্দময় বাক্‌চতুর; সে মরণাহত, কুমুদ প্রাণবান! এমন অবস্থায় সেবার মন তাকে ফেলিয়া কুমুদকেই যে বেশী ভালোবাসিবে এতে আর আশ্চর্য কি? কুমুদ স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিতে একটুও লজ্জা করে নাই যে সেবাকে তার ভালো লাগিয়াছে, সেবার বোন—অর্থাৎ সেবাকে পাইলে সে বিবাহ করিত; সেবাও অসঙ্কোচে একদিনের পরিচিতকে বার বার বলিয়াছে—তাকে ছাড়িয়া দিতে তার কষ্ট হইতেছে। সেবা ও কুমুদ কতবার

কোন্ কোন্ কথায় পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করিয়াছে হীরক ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাই মনে করিতে লাগিল; এবং ক্রমে তাদের সব কথার মধ্যেই এক একটা গূঢ় অর্থ সে আবিষ্কার করিতে লাগিল। তার মনে হইল সেবা আর আগের মতন তার সঙ্গে হাসিয়া আগ্রহ করিয়া কথা বলে না, কিন্তু সদ্যপরিচিত কুমুদের সঙ্গে হাসি ও কথায় তার আগ্রহের অন্ত ছিল না, একদিনের আলাপেই সেবা কুমুদকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু হীরক তার স্বামী হইলেও তাকে এখনও আপনিই বলে; সেবা আর তার কাছে বেশীক্ষণ থাকে না, কিন্তু বেশীক্ষণ সঙ্গ পাইবে বলিয়া সেবা কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিল। হীরক অকারণ হিংসায় ভুলিয়াই গেল যে সে নিজেই সেবার সঙ্গে কথা বলে না বলিয়া সেবা তার কাছে আগের মতন আর হাসিখুসী লইয়া থাকিতে পারে না; হীরক নিজে সেবাকে তুমি বলে, কিন্তু সেবাকে বলিতে অনুরোধ একবারও করে নাই। হীরকের নিজের আচরণের সমস্ত ত্রুটি এখন হিংসায় সে সেবার উপর আরোপ করিয়া আরো অশান্তি ও পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। সেবা যে একান্ত তার নিজস্ব, সেবার ভালোবাসা যে কেবল তারই প্রাপ্য, এই বোধ এতকাল পরে হীরকের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়া সেবাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যস্ত ও উৎসুক হইয়া উঠিল।

কুমুদ আসাতে প্রথমে হীরক যেমন উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কুমুদ আবার আসিবে ভাবিয়া হীরক এখন তেমনি ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে কুমুদকে তার দিদি যদি ছাড়িয়া না ছায়, তাকে হঠাৎ চাকরীর জায়গায় চলিয়া যাইতে হয়, ত বেশ হয়। সমস্ত রাত এইসব ভাবনাতে হীরকের ভালো করিয়া ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে সেবা হীরকের ঘরে আসিয়া নিত্যকার মতো তার খাটের কাছে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া হীরকের জলখাবার

একটি টুলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল। হীরক হঠাৎ সেবার হাত ধরিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিল—সেবা, আমায় তুমি ভালো কোরে তোল।

সেবা আশ্চর্য ও খুসী হইয়া বড় বড় চোখ দুটি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল ও বিস্ময়ের আতিশয্যে বিস্ফারিত করিয়া হীরকের দিকে তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল—আপনি ত ভালো হয়ে গেছেন!

হীরক কাতর মুখে জিজ্ঞাসা করিল—আমি ভালো হয়ে উঠলে তুমি আমাকে ছেড়ে চোলে যাবে না?

সেবা হাসিয়া বলিল—আপনি তাড়িয়ে না দিলে ত আমার যাবার জো নেই।

হীরক সেবার উত্তর শুনিয়া একটু দমিয়া গিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—জো নেই কেন? তোমার ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পূর্ণই আছে।

সেবা গম্ভীর হইয়া বলিল—না, আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি।

হঠাৎ হীরক গম্ভীর হইয়া সেবার হাত ছাড়িয়া দিল। সেবার হাত হঠাৎ আশ্রয়চ্যুত হইয়া আছড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িল। সেবা আর-একবার হীরকের মুখের দিকে কতরতাভরা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আবার হেঁট হইয়া পাঁউরুটির চিলতেয় মাখন মাখাইতে লাগিল।

ভাবপ্রবণ হীরকের অভিমান উথলিয়া উঠিয়াছিল—সেবা মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া তাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, কেবল তার জন্যই তার প্রতি সেবার কোনো টানই নাই! তার প্রতি সেবার ভালোবাসার অভাব হীরকের মনকে পীড়া দিয়া ব্যস্ত উতলা করিয়া তুলিল। কি করিলে সে সেবার ভালোবাসা পাইতে পারে এই চিন্তাতে এমন ব্যস্ত তন্ময় হইয়া উঠিল যে তার মনে রমার অভাবের বেদনা একরকম চাপা পড়িয়াই গেল।

সেবাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না হীরকের মন কি বলিতেই বা চায়, আর কি জানিতেই বা চায়। সে যে মেয়ে—সে পরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তার সেবা করিতে পারে, যাকে ভালোবাসে তার জন্য অনায়াসে প্রাণপাত করিতে পারে, কিন্তু আমি তোমায় ভালোবাসি এই কথাটি সে কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না যতক্ষণ না সে পুরুষের দিক থেকে অজস্র প্রমাণ ও ক্রমাগত অনুরোধের আগ্রহভরা তাগাদা পায়। তাই সেবা হীরকের অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে অস্পষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য হইতেছিল। কিন্তু হীরকও সেবাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেছিল না, কি জানি যদি তার প্রশ্ন সেবার না'র আঘাতে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু হীরকের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ঐ একটি অক্ষরের উত্তর হাঁ কি না শুনিবার জন্য; কারণ, কখন যে কুমুদ আসিয়া উপস্থিত হইয়া যে-উত্তর হাঁ এখনও হইতে পারে তাকে না করিয়া তুলিবে তার ত ঠিক নাই। সেবা কিন্তু কুমুদেরই আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল; বসন্তের আগমনে যেমন গাছপালার অন্তর হইতে আনন্দ রূপ ধরিয়া পুষ্পপল্লবের আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে, তেমনি কুমুদের আগমনে বন্ধুপ্রীতি দাম্পত্য-প্রীতিকেও স্পষ্ট ও সুপ্রকাশ করিয়া তুলিবে; তাদের যে মিলন অকস্মাৎ ঘটিয়াছিল তার উপলব্ধিও একদিন অকস্মাৎ ত হইবার নয়, তাহা কালের কোলে লালিত হইয়া বিনা আড়ম্বরে হয়ত উভয়ের অগোচরেই উভয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিবে; এর জন্য অপেক্ষা চাই।

অনেকদিন পরে আজ হীরক সমস্ত দিন সেবাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে কাছে রাখিতেছিল; সেবা একটু কোনো কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেই হীরক ব্যস্ত হইয়া একটু পরেই চীৎকার করিতেছিল 'সেবা' 'সেবা', অথবা লোকনাথকে খুঁজিতে পাঠাইতে-ছিল—'লোকাদা, দেখ্ ত তোর বৌমা কি করছে?' রুগ্ন শয্যাগত শিশুর মতন আজ সে সেবাকে একবার একটু চোখের আড়াল

হইতে দিতে পারিতেছিল না, সেবার মন যে তাকে দখল করিয়া বসিতে হইবে কুমুদ ফিরিয়া আসিবার আগেই। আজ আবার আগের মতন সেবাকে বই পড়িয়া গান গাহিয়া গল্প করিয়া হীরকের আবদার রাখিতে হইতেছিল; আজ বালিকা-বিদ্যালয় জমিদারী কেউ আর আমল পাইতেছিল না; ম্যানেজার কোনো কাজ লইয়া সেবার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিলেই হীরক বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—'বাড়ী-সুদ্ধ লোকের কেবল বৌমা বৌমা? বৌমাই যদি সব কাজ করবে ত তোরা আছিস্ কি করতে? যা—ম্যানেজারবাবুকে বলগে যা—বৌমা যেতে পারবে না।' সেবা যদি একটু উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছিল—'ম্যানেজারবাবু কি বলছেন, আমি চট্ কোরে শুনে আসব?' অমনি হীরক ছেলে-মানুষের মতন ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিতেছিল—'আমার কাছে থাকতে তোমার ভাল লাগে না একটুও, মা?' আর সেবার ওঠা হয় না। হীরকের এই আগ্রহ ও আসক্তি সেবাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল, সে যে-বস্তুর স্বাদ পাইয়া হারাইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইয়া তার আর আনন্দের অবধি ছিল না। সেবা ত কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া মিশিবার অবসর পায় নাই, সে হীরককেই প্রথম একেবারে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া পাইয়াছিল; তাই তার কুমারী ভালোবাসা হীরকের দিকেই ধাবিত হইয়াছিল; এখন তার ভালোবাসার প্রতিদান হীরকের কাছ হইতে পাইয়া তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এবং এই পরম লাভের জন্য তার অন্তর কুমুদের কাছেই কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল; ভাগ্যিস কুমুদ আসিয়াছিল তাই জীয়ন-কাঠির স্পর্শে হীরকের মরণাপন্ন মন প্রণয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিল। সেবার মন কুমুদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

বিকালের গাড়ীখানা যখন হুসহুস শব্দ করিয়া চলিয়া গেল

তখন সেবা বলিল—কুমুদ-ঠাকুরপো এই গাড়ীতে এলেন কি না কে জানে? স্টেশনে একবার গাড়ীটা পাঠালে হত।

সমবয়সী যুবকদের মজলিসে অভিভাবক বৃদ্ধের অকস্মাৎ আবির্ভাবে যেমন তাদের আনন্দ-কোলাহলের তাল কাটিয়া যায়, সারাদিনের জমাট আনন্দ-মিলনের মাঝখানে কুমুদের নাম হওয়াতে হীরকের মনের ভরা সুরের তাল তেমনি কাটিয়া গেল—সে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—হ্যাঁঃ! কুমুদ ত আর তোমার মতন ক্ষ্যাপেনি যে কাল দিদির বাড়ী গিয়ে আজই চোলে আসবে? কুমুদকে তোমার খুব ভালো লেগেছে, না?

সেবা হীরকের প্রশ্নের গূঢ় অভিসন্ধি না বুঝিয়াই সরল ভাবে বলিয়া ফেলিল—লাগবে না? আপনি যে বলেছেন—More than my brothers are to me!

হীরক আরো গম্ভীর হইয়া পড়িল। কিন্তু যতই তার মনে হইতেছিল সেবা অনায়ত্ত হইয়া যাইতেছে, ততই তাকে আয়ত্ত করিবার আগ্রহ হীরকের প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। হীরক অনুভব করিতেছিল—কালবৈশাখীর মেঘ যেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ঝড়ের হাওয়ার পিঠে চড়িয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে, তার মনের মধ্যেও তেমনি একটা দুর্নিবার উন্মত্ত আবেগ ও অস্বস্তি সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে। হীরক হঠাৎ সেবার হাত ধরিয়া তাকে কাছে টানিয়া বলিল—সেবা, আমি ত তোমাকে তুমি বলছি অনেকদিন থেকে; কিন্তু আমি কি তোমার চিরকালই আপনি থেকে যাব? কুমুদকে ত একদিনেই তুমি বললে?

সেবা হাসিয়া হীরকের মুখের উপর দৃষ্টি হইতে প্রণয়-ধারা বর্ষণ করিয়া বলিল—কুমুদ-ঠাকুরপো যে জোর করে তুমি বলিয়ে ছাড়লে।

হীরক অভিমানে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—তোমার সঙ্গে কি আমার

জোরের সম্পর্ক যে জোর কোরে তোমার কাছ থেকে আদর আদায় করতে হবে ? যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ !—তার মূল্য কি ?

হীরক ভুলিয়া গিয়াছিল যে প্রণয়ের ধারা এই যে সে কিছু স্বয়ং উপযাচক হইয়া ছায় আর কিছু পুঁজি করিয়া রাখে অপরের অপহরণের জন্য ; দান করিতে হইলে একজনকে যেমন হাত উবুড় করিতে হয়, অপরজনকে তেমনি হাত পাতিতেও হয়, কেবল ভিক্ষার্থী হইয়া হাত পাতাতে যেমন অপমানের লজ্জা আছে, কেবল দিতে গিয়া দানকে অবহেলায় মাটিতে ফেলাতেও তেমনি অপমানের লজ্জা আছে। হীরক এই কথাটা ভুলিয়া বসিলেও সেবা ভুলিয়া যায় নাই, তবু সে নিজে হীনতা স্বীকার করিয়া লজ্জিত হাসিমুখে বলিল—চলো, বাগানে বেড়িয়ে নিয়ে আসি—অনেকদিন বাগানে যাওনি, কত ফুল ফুটেছে দেখবে চলো।

সেবা এত সহজে তাকে তুমি বলিল দেখিয়া হীরকের মনের সমস্ত ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। হীরক হাসিয়া বলিল—তবে তোমার এই দুর্বহ বোঝাটাকে তুলে নিয়ে চলো।

সেবা খুসী মনে হাসিয়া বলিল—দুর্বহ মনে করলে এ বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতাম না।

সেবার মুখ থেকে তার প্রণয়ের এই একটু আভাস-পরিচয় পাইয়াই হীরক আজ কৃতার্থ হইয়া গেল। সে বলিল—আমি আর বোঝা হয়ে থাকব না সেবা. আমি চেষ্টা কোরে ভালো হয়ে উঠব। তুমি আমায় ধরো ত দেখি, নিজে উঠতে পারি কিনা।

সেবা অতি আনন্দিত হইয়া তাড়াতাড়ি হীরকের বেড়াইবার চেয়ার গাড়ীখানা ঠেলিয়া আনিয়া হীরকের খাটের সঙ্গে ঠেকাইয়া রাখিল, এবং হীরককে ধরিয়া অনেক কষ্টে বিছানা হইতে তুলিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিল। একলা সেবা অবশাঙ্গ হীরককে তুলিয়া গাড়িতে বসাইবার পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল এবং হীরকও অবশ অঙ্গ তুলিয়া গাড়ীতে বসিবার চেষ্টায় হাঁপাইয়া পড়িতেছিল, তবু দুজনেই নিজের

নিজের কৃতকার্যতার আনন্দে এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, তারপর সেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দম লইয়া হীরককে ঠেলিয়া বাগানে লইয়া চলিল।

বাগানের মধ্যে নামিয়া হীরক দেখিল কেয়ারীতে কেয়ারীতে হাজারো গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাদের কত যে রং—লাল হলুদ শাদা গোলাপী,—এক লালেরই কত রকম আভা—ফিকে ঘোর কাল্‌চে বেগুনে খয়েরী। বিলাতী মস্যুমী-ফুলের ক্ষেতের পাশে সর্ষে-ফুলেরও জর্দা-জলুশ বাগানে যেন রূপের আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সেবা হীরককে ঠেলিতে ঠেলিতে শেফালী-বীথিকায় লইয়া গেল,—একটা পথের দুধারি কেবল শিউলী ফুলের গাছ ; সন্ধ্যাবেলার মুখ আঁধার করা দেখিয়া গাছগুলি যেন শত শুভ্র দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। শিউলী ফুলের সঙ্গে নিশারাণী হাস্নুহানার গন্ধ মিশিয়া এ-দিকটার বাতাস যেন উগ্র গন্ধে আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। হীরক পিছন দিকে মাথা হেলাইয়া সেবার দিকে চোখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে।'

সেবার চোখ তখন কিন্তু হীরকের দিকে ছিল না, সে সামনের দিকে তাকাইয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিয়া উঠিল—কুমুদ-ঠাকুরপো আসছেন।

হীরকের সমস্ত কবিত্ব যেন বুকে ছোরা বিঁধিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। সে মাথা সোজা করিয়া দেখিল—বাস্তবিকই কুমুদ হাসিমুখে সেইদিকে আসিতেছে। হীরকের মুখ রাগে ঈর্ষায় হতাশার ভয়ে নীল হইয়া উঠিল।

হীরক বাগানে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে দেখিয়া কুমুদ খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কুমুদ এত শীঘ্র ফিরিয়াছে দেখিয়া সেবা খুসী হইয়া উঠিয়াছিল,—তাই তাদের দুজনের কারোই লক্ষ্য ছিল না হীরকের মুখের ভাবের দিকে। কুমুদ কাছে আসিয়াই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—'প্রণাম বৌদিদি।' তারপর সে হীরকের

কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—সকাল সন্ধ্যা এমনি কোরে বেড়ালে পনেরো দিনেই দুর্বলতা সেরে যাবে। আমি দিন পনেরো আছি। যে দিন যাব সে দিন তুই আমাকে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবি নিশ্চয়।

হীরকের মুখ শুকাইয়া উঠিল—পনেরো দিন থাকিবে! নিজের দিদির বাড়ী একদিনের ঝাঁকি-দর্শন দিয়া ছুটিয়া আসিয়া এখানে আড্ডা গাড়িবার মানে কি?

হীরককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবা বলিল—তুমি এত শিগ্‌গির আসবে আমরা মনে করিনি। তোমার দিদি ছেড়ে দিলেন যে?

কুমুদের দিদি হীরকেরও দিদির মতন। হীরকের অসুখ ও কুমুদের আগমনে তার উল্লাসে উঠিয়া বসার কথা শুনিয়া তিনি আর কুমুদকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। কুমুদ সে কথা না বলিয়া হাসিয়া বলিল—নতুন দিদির টানের জোর এমন প্রবল হল যে পুরোনো দিদিকে ছেড়ে দিতেই হল।

সেবা সুখী হইয়া হাসিতে লাগিল, কুমুদও হাসিল। কিন্তু হীরকের কানের ভিতর হইতে মনের ভিতর পর্যন্ত জ্বালা করিয়া উঠিল।

কুমুদ হীরকের গাড়ীর পিছনে গিয়া হাতল ধরিয়া সেবাকে বলিল—ছাড়ুন, আমি গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

সেবা হাতলে একটা হাত রাখিয়া গাড়ীর পাশে পাশে চলিতে লাগিল এবং কুমুদও গাড়ী ঠেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সেবা ও কুমুদ নানা কথা বলিতেছিল, ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছিল, কিন্তু হীরকের মনে স্বস্তি ছিল না। ভগবান যে মানুষের মাথার পিছনে চোখ না দিয়া মানুষকে কতখানি অসুবিধায় ফেলিয়াছেন হীরক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল। কুমুদ ও সেবা ঠিক তার মাথার পিছনে দাঁড়াইয়া চলিতেছে, অথচ সে তাদের মুখের ভাব ও ইঙ্গিতের সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া আছে, এতে হীরকের

বিরক্তি মন ছাপাইয়া উঠিতেছিল। খানিকদূর গিয়া হীরক হঠাৎ বলিল—আমার আর বেড়াতে ভালো লাগছে না।

কুমুদ বলিল—আচ্ছা একটু বসা যাক তা হলে।

কুমুদ গাড়ী ঠেলিয়া একটা বেঞ্চির কাছে দাঁড় করাইয়া বলিল—বসুন বৌদিদি।

হীরকের গাড়ীর দুপাশে সেবা ও কুমুদ বসিল। সেই জায়গাটা বাগানের এক টেরে, তারপরেই বিস্তৃত মাঠ। মাঠে আকের ক্ষেতে আক কাটিয়া চাষারা গাড়ী বোঝাই করিতেছে; আলু তুলিয়া বস্তাবন্দী করিতেছে; কোথাও মটর কলাই মাড়া হইতেছে। সেবা সেইসব দেখিতে দেখিতে বলিল—চাষাদের এত জায়গা, কেউ একটা বাগান করে না! আমি হলে খালি বাগানই করতাম।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—তা হলে আপনাকে হয় ভোম্‌রা নয় প্রজাপতি হতে হত। মানুষের ত শুধু মধু খেয়ে পেট ভরে না। আর চাষাদের ক্ষেতও ত বাগানই। আপনাদের বাগানের মধ্যে এতটুকু কেয়ারীর মধ্যে গোটা কতক গাছ জীয়ানো থাকে, আর ওদের বড় বড় ক্ষেতে মর্সুমী গাছ জন্মে। আপনাদের সঙ্গে তফাৎ ওদের এই যে আপনারা কেবল ফুল পেয়েই তুষ্ট,—মা ফলেষু কদাচন,—আর ওরা নিষ্ফল কিছুই যেতে দ্যায় না, ওদের কর্মেণ্য-বাধিকারঃ ফল আদায় করবার জন্যেই। সমস্ত দেশের লোক যদি আপনার মতন কবি হত বৌদিদি, তবে কারো আর বাঁচতে হত না।

সেবা কুমুদের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। কুমুদও হাসিতে লাগিল। কিন্তু হীরক সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। সে সেবা ও কুমুদের অসঙ্কোচ গল্প ও হাসি শুনিয়া এমন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, অথচ কিছু বলিতেও পারিতে-ছিল না। হঠাৎ হীরক দেখিল কুমুদের রূপো-বাঁধানো মোটা বেতের ছড়িটা তার গাড়ীর কাছে মাটিতে পড়িয়া আছে। সে ঝুঁকিয়া সেইটা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অতদূর ঝুঁকিতে পারিতেছিল

না। সেবা তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুমুদ চট্ করিয়া সেবার হাতের উপর হাত রাখিতেই সেবা কুমুদের দিকে চোখ ফিরাইল এবং কুমুদ চোখের ইসারা করিয়া বারণ করিল—সেবা যেন লাঠিটা কুড়াইয়া না ছ্যায়, হীরক নিজের চেষ্টাতেই ওটা তুলুক। সেবা কুমুদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লাঠি তুলিতে নিবৃত্ত হইয়া সোজা হইয়া বসিল। হীরক পাশে ঝুঁকিয়া ছিল বলিয়া দেখিতে পাইল—সেবার হাতের উপর কুমুদ হাত রাখিয়া ইসারা করিয়া হাসিল ও সেবাও হাসিল। তাকে গোপন করিয়া তাদের এই ইসারা ও হাসি হীরকের অন্তর্দাহ উপস্থিত করিল। সে এক ঝট্‌কায় নিজের আড়ষ্ট শিরদাঁড়াকে বাঁকাইয়া নীচু হইয়া লাঠিটা কুড়াইয়া লইল; এবং যেমন করিয়া লগি ঠেলিয়া লোকে নৌকা বায়, তেমনি করিয়া মাটিতে লাঠির গুঁতো মারিয়া মারিয়া গড়গড়ে গাড়ীটাকে চালাইয়া হীরক একলাই বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। সেবা তাড়াতাড়ি গাড়ী ধরিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্য উঠিতেছিল, কিন্তু কুমুদ বারণ করিল—না, আপনি যাবেন না, ওকে হাত পা নেড়ে পরিশ্রম করতে দিন, ওর শরীরের স্বচ্ছন্দতা muscle-control আবার ফিরে আসুক।

সেবা একটু খুসী একটু ভীত হইয়া বলিল—উনি কিন্তু রাগ কোরে যাচ্ছেন।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—যাক। চিরকাল ওর একটুতেই রাগ, আবার একটুতেই খুসী। Will force জাগ্‌বার জন্যে একটা excitant কিছু চাই ত। এই রাগের উত্তেজনায় ওর ইচ্ছাশক্তি যে জাগল এতে ওর ঢের উপকার হবে। ও সহজ মানুষ হয়ে যাবে দেখবেন।

বন্ধু ডাক্তারের এই আশ্বাসে সেবার মন আনন্দিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মুগ্ধ অতৃপ্ত আকুল দৃষ্টিতে হীরকের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মোড় ঘুরিবার সময় মুখ ফিরাইয়া হীরক দেখিল সেবা ও কুমুদ প্রফুল্ল হাসিমুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, সে যে রাগ

করিয়া একলা চলিয়া যাইতেছে সে দিকে তাদের লক্ষ্যও নাই। হীরক মনের সমস্ত রাগের চিহ্ন মূক মাটির বুকে লাঠির গুঁতায় গুঁতায় রাখিতে রাখিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ীর সিঁড়ির কাছে গিয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ স্বরে হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—এই, কে আছিস?

অমনি তাড়াতাড়ি লোকনাথ ও অপর চাকর একজন ছুটিয়া আসিয়াই দেখিল হীরক একলা লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং এই গুরু পরিশ্রমে সে হাপরের মতন হাঁপাইতেছে ও ফাল্গুন মাসের শীতেও তার কপাল হইতে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। লোকনাথ ছুটিয়া কাছে আসিতেই হীরক লাঠি তুলিয়া তাকে এক ঘা কশাইয়া দিয়াই লাঠি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল ও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—তোরা সব কোথায় থাকিস্ লোকাদা? আমার মা কিম্বা রমা থাকলে তোরা আমাকে কখনো এমন কোরে একলা ছেড়ে থাকতে পারতিসনে।

হীরক শিশুর মতন রাগে অভিমানে ব্যথায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ লোকনাথ বিনা বাক্যে গাড়ী ঠেলিয়া ঘরে তুলিল এবং শিশুকে যত্ন করিবার মতন সস্নেহে সন্তর্পণে হীরকের গায়ের ঘাম মুছাইয়া কাপড় জামা বদলাইয়া, ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। হীরক বিছানায় শুইয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল—লোকাদা, আমি একটু জল খাব।

লোকনাথ দৌড়িয়া গিয়া একটা কাঁচের গেলাসে করিয়া কমলা-লেবুর সরবৎ আনিয়া দিল। হীরক এক চুমুকে সেটা পান করিয়া ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল ও দেখিতে দেখিতে মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সেবা ও কুমুদ যখন হীরকের ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন দেখিল হীরক ঘুমাইতেছে, লোকনাথ তার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

সেবা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—লোকনাথ-দাদা, উনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

লোকনাথ সেবার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সেবা যদি হীরককে দেখিতে শুনিতে না পারে, তবে কেন সেবা তার হাতের কাজ কাড়িয়া লয় ? সে ত হীরককে মানুষ করিয়া এত বড় করিয়াছে, যতদিন না মরিতেছে ততদিন সে তার খোকা-বাবুকে দেখিতে পারিবে। অসুস্থ খোকা একলা গাড়ী ঠেলিয়া ঠেলিয়া আসিল, অথচ তাহা দেখিয়াও সেবা বা কুমুদ কেউ যে তাকে সাহায্য করিল না এর মানে কি, আর হীরকের এই ক্রোধের কারণই বা কি ? লোকনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হীরকের মনের সন্দেহ অশিক্ষিত সাধারণ লোক তারও মনে গিয়া উঁকি মারিতেছিল। তাই সে সেবার প্রশ্নের উত্তর কথায় দিতে না পারিয়া কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে—হ্যাঁ, হীরক ঘুমাইয়াছে।

সেবা মৃদুস্বরে বলিল—আমি এখানে থাকছি লোকনাথ-দাদা, তুমি ডাক্তার-ঠাকুরপোকে মুখহাত ধোবার জল দাওগে। ইনি উঠলে একসঙ্গে খেতে দেবো।

কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তখনো হীরকের ঘুম ভাঙিল না। সেবা লোকনাথকে ডাকিয়া বলিল—দাদা, তুমি একটু বাবুর কাছে বোসো, আমি দাদামশায় আর ডাক্তার-ঠাকুরপোকে খাবার দিয়ে আসি। বাবু উঠলেই আমায় ডেকো।

সেবা লঘু নিঃশব্দ পদে হনহন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেবা আনন্দবাবু ও কুমুদকে খাওয়াইয়া বাড়ীর চাকরদাসীদের খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া হীরকের খাবার ফুটন্ত গরম জলের উপর বসাইয়া লইয়া যখন আবার হীরকের ঘরে ফিরিয়া আসিল

তখন রাত্রি এগারোটা। সেবা টেবিলের উপর হীরকের খাবার সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—লোকনাথ-দাদা, তুমি খাওগে যাও। আমাকে স্টোভটা আর স্পিরিটের বোতলটা দিয়ে যেয়ো, দুধ গরম কোরে দিতে হবে।

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল—আপনার খাওয়া হয়েছে বৌমা?

সেবা ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিল—না, ওঁর এখনো খাওয়া হয়নি, আমি খাব কি কোরে। কামিনীকে বোলে এসেছি আমার খাবার ঢেকে রাখতে।

হীরককে সেবার অবহেলা করিবার যে যে কারণ লোকনাথের মনে ক্রমশ সঙ্গত ও সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল, সেবার এই কথায় সব ভেস্তিয়া গেল। লোকনাথ বুড়া গোলে পড়িয়া ঠোঁট উল্টাইয়া মনে মনে স্বীকার করিয়া গেল, ব্যাপারটা সে একটুও বুঝিতে পারিতেছে না।

লোকনাথ খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—হীরক তখনো ঘুমাইতেছে ও সেবা তার মুখের কাছে বসিয়া হীরকের বালিসে কনুইএর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া তার কপালে মাথায় ধীরে সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতেছে। লোকনাথ সেবার খুব কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও স্নেহের সহিত বলিল—রাত যে বারোটা বেজে গেছে বৌমা।

সেবা চুপিচুপি বলিল—তুমি শোওগে, দরকার হলে ডাকব।

লোকনাথ ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আর আপনি?

সেবা বলিল—উনি উঠে না খেলে ত আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারব না।

লোকনাথের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে পাশের ঘরের মেঝেতে বিছানায় লেপ ঢাকা দিয়া শুইতে শুইতে বলিল—হরি হে!

এই 'হরি হে' ডাকের মধ্যে অনেকখানি অকথিত আনন্দ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সেই রহস্যময়ের চরণে নিবেদন করিয়া বুড়া শুইয়া পড়িল।

হীরকের যখন ঘুম ভাঙিল তখন রাত্রি একটা। সে চোখ মেলিয়াই দেখিল সেবা একেবারে তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে। হীরক অশুচি স্পর্শের সঙ্কোচে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল —ঘরে আর কে আছে?

সেবা বলিল—আর কেউ নেই। রাত অনেক হয়েছে।

এত রাত পর্যন্ত যে সেবা তার জাগরণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া হীরক বলিল—তোমাকে একলাই আমি খুঁজছিলাম। দেখ, আমি জানি যে আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু, আমার মতন লোককে তুমি ভালোবাসতে পারো না। আমার সঙ্গে বিয়ের মন্ত্র গোটাকতক পড়া হয়েছিল বোলেই যে তোমার মন আমাকেই ভালোবাসতে বাধ্য এমন ভাববার মতন মূর্খও আমি নই। তুমিও যখন আমাকে ভালোবাসতে পারোনি, আমিও তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি, তখন আমাদের পরস্পরকে জড়িয়ে না রেখে পৃথক ও দূর হয়ে যাওয়াই উচিত। আমাদের বিয়ে বোলে যে একটু অনুষ্ঠান হয়েছিল তা সমাজ আইন বা ধর্ম কারো চোখে বিবাহের বন্ধন বোলে স্বীকৃত হবে না—তখন আমার অশৌচ অবস্থা, আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মন্ত্র পড়াও অসম্পূর্ণ, তার উপর তুমি আমি অসবর্ণ—এ অবস্থার বিয়ে বিয়েই নয়। মানুষ কাউকে বিয়ের মন্ত্র না পোড়েও ভালোবাসে, আবার কাউকে বিয়ের মন্ত্র পোড়েও ভালোবাসতে পারে না; কিন্তু বিয়ের মন্ত্র পড়া হলে স্বাধিকারের একটা বোধ জন্মে। সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেখলে মন কষ্ট পায়—ভালোবাসা না থাকলেও। আমারও সেই রকম কষ্ট হচ্ছে। দোহাই তোমার, তুমি আমারই বাড়ীতে থেকে আমারই চোখের সামনে আমার অধিকারবোধকে ব্যঙ্গ কোরো না; তুমি আমাকে দয়া করো, আমাকে মুক্তি দিয়ে তুমি আর যেখানে খুসী যাও। ঐ দেরাজটার টানার মধ্যে আমার জমিদারীর দানপত্র আছে দাও দেখি।

সেবা আড়ষ্ট আকাট হইয়া হীরকের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতেছিল। হীরক প্রায় স্বাভাবিক স্বরেই এইসব কথা বলিতেছিল, তাতেই সেবা বুঝিতেছিল ভাবপ্রবণ ও আবেগময় হীরক কত বেশী রাগিয়াছে যাতে তার ক্রোধ এমন উচ্ছ্বাসহীন শান্ত হইয়াছে। কোনো কোনো কঠিন বস্তু উত্তপ্ত হইতে হইতে শুভ্র হইয়া উঠে—হীরকের এই উত্তাপও যেন তেমনি বিষম। সেবা ভয়ে দুঃখে লজ্জায় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গিয়া হীরকের দানপত্র আনিয়া দিল।

হীরক সেই দানপত্র হাতে লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—আমার এই জমিদারীটাই হয়েছে যত নষ্টের মূল! তুমি ফুলের বাগানে সুখে থাকবার লোভে আমাকে গ্রহণ করতে স্বীকার করেছিলে। এই লোভ থাকাতেই তুমি এখনো আমায় ছেড়ে তোমার মনের পথে যেতে পারছ না। কাল সকালে আমি আমার সমস্ত জমিদারী তোমাকে লেখাপড়া কোরে ছেড়ে দেবো—তুমিও দয়া কোরে আমাকে ছেড়ে দিয়ো, আমারই চোখের সামনে থেকে আমাকে উপহাস আর উপেক্ষা কোরে জ্বালিয়ো না। আমি রেহাই চাই, রেহাই চাই!

এই শেষের কথা কয়টা একটু জোর গলায় তীব্রস্বরে বলিয়া হীরক দানপত্রখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া সেবার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রূর স্বরে বলিল—আমার জমিদারী ত মেয়ে-পাঠশালার বেনামীতে বেহাত করেইছিলে, সেইটা আমি প্রকাশ্য ভাবেই তোমায় দিয়ে দেবো কালই সকালে। তুমি ফুলের বাগানে মনের মতন লোক নিয়ে সুখে থেকো, আমায় বুদ্ধিতেও পঙ্গু মনে কোরে আমার চোখের সাম্‌নে আমায় জ্বালিয়ো না।

এই মিথ্যা তিরস্কারের অপমানে সেবার মন রাগে ও দুঃখে যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, সে আর আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। হীরকের সামনে পাছে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ

হইয়া পড়ে এই ভয়ে সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া উল্কার মতন ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া বাগানের মধ্যে নামিয়া গেল। হীরক উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি। ঝিঁঝিঁ ডাকার শব্দটুকুও কোথাও নাই। কেবল নিস্তব্ধতার একটা থমথমে ঝমঝমে আওয়াজ কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতেছিল। আর তারই মধ্যে আসিয়া কানে লাগিতেছিল একটা চাপা কান্নার গোম্‌রানো। হীরক কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল—এই কান্না কি সত্য, না তার মনের ভ্রম।

কিছুক্ষণ পরে হীরকের মনে হইল একজন কে যেন জুতার শব্দ চাপিয়া চাপিয়া সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া বাগানে নামিয়া গেল। অমনি হীরকের মনে হইল—ও নিশ্চয় কুমুদ!

সেবার সঙ্গে সে এখনি সমস্ত সম্পর্ক পরিহার ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তাকে চিরবিদায় দিয়াছে; কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ গোপনতার মধ্যে সেই সেবার কাছে কুমুদ চোরের মতন যাইতেছে ভাবিতেই হীরকের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল, তার অবশ দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অল্পক্ষণ বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিল, তারপর উঠিয়া বসিল,—হঠাৎ তার কানে গেল ছুজনের চাপা গলার কথা! হীরক আপনার দেহের অবশতা ভুলিয়া উত্তেজনার ঝোঁকে খাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িল ও অনেক দিনের অব্যবহৃত দুর্বল পায়ে টলিতে টলিতে দালানে গিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে গোপনে রাখিয়া অপরদের দেখিবে ও কথা শুনিবে বলিয়া হীরক দালানের জোড়া থামের মাঝখানে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—শুভ্র জ্যোৎস্নায় বাগান ভরিয়া গিয়াছে, যেন বসন্তলক্ষ্মী ক্ষীরসাগর হইতে সুধার ঝারি ফুলের সাজি হাতে করিয়া উত্থিত হইতেছেন! সেই পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ বাগানের কোলে সিঁড়ির নীচের ধাপে বসিয়া সেবা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, আর

তার গা ঘেঁষিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া আছেন বৃদ্ধ আনন্দবাবু। সেবা কান্নার ভিতর হইতে কথা ছাঁকিয়া তুলিয়া বলিতেছে—দাদামশায়, আপনারা ফুলের বাগানের লোভ দেখিয়ে আমাকে এখানে এনেছিলেন ; বাগানে ত ফুল প্রচুর ফুটেছে, কিন্তু এতে ত মনের লোভ মিটছে না। আমার মনের বাগানের ফুলও যে ফুটে উঠছিল দাদামশায়। আমার বিনা দোষে উনি আমাকে অপমান কোরে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছেন। আমার মনের বাগানে যে ফুল ফুটেছিল সে ত তাঁকেই অর্ঘ দেবো বোলে প্রতিদিন প্রতীক্ষা করছিলাম, তিনি ত একবার ফিরেও দেখলেন না। এ আমার কী হল দাদামশায়। আমি ওঁকে ছেড়ে যাবই বা কোথায়, আর থাকবই বা কেমন কোরে ? উনি বলছেন যে আমাদের বিয়ে অসিদ্ধ। কিন্তু আমি ত প্রতিদিন টের পাচ্ছি সে-বন্ধন আমার দিকে কতখানি দৃঢ় অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। দাদামশায়, আবার আমাকে আপনার বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন—আজই, এই রাত্রেই চারটের গাড়ীতে ; দিনের বেলা আমি ওঁর সামনে দিয়ে, লোকের সামনে দিয়ে যেতে পারব না।

সেবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আনন্দবাবুর দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল আর তার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া তরল হীরকধারার ন্যায় সুন্দর মহামূল্য দেখাইতেছিল। আনন্দবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেবার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন—তাই চ দিদি। হঠাৎ তোকে হীরকের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ভালো করিনি। মহাদেব বুঝেছিলেন যে গৌরীকে পেতে হলে তপস্যা করতে হয়, অনায়াসলব্ধ বস্তুর মূল্যবোধ হয় না। তোর অভাব না হলে হীরক তোর মূল্য বুঝবে না। চ ভাই, এই বুড়ো ঠাকুরদাদা আজ তোকে নিয়ে elope করবে।

এই গভীর দুঃখ-বেদনাকে বৃদ্ধ রসিকতা করিয়া ভুলাইয়া দিবার জন্য চোখের জল মুছিতে মুছিতে হাসিলেন। সেবাও চোখের

জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার জন্য আনন্দবাবু ও সেবা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন হীরক টলিতে টলিতে অবশ অনভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ির ধাপ নামিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়াই সেবার দুই চোখ বিস্ময়ে ভয়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, আনন্দবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—সেবা যা যা ভাই, হীরককে ধরগে, এখুনি ঠিকরে নীচে পোড়ে যাবে।

সেবা ছুটিয়া আসিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া হীরককে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল, হীরকও তার এক হাত সেবার গলায় রাখিয়া আর-এক হাতে সেবার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—চলো আমরা বাগানে যাই।

সেবা ধীরে ধীরে সন্তর্পণে হীরককে এক এক ধাপে নামাইয়া নীচে লইয়া যাইতে লাগিল। আনন্দবাবু হাস্যোজ্জ্বল মুখে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

হীরক বাগানে গিয়া সেবার মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত হাসিমুখে বলিল—বড় ভুল করেছিলাম সেবা, আমাকে ক্ষমা করো। আজ এতদিনে আমাদের মিলন-বসন্তের সুখের জ্যোৎস্নায় বিয়ের ফুল ফুটল! চলো দুজনে বাইরের বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে যাই—আজ আমাদের অন্তরে বাহিরে ফুলশয্যা!

সেবার মুখের লজ্জিত হাসির আভা লাগিয়া তার চোখের জল চকচক করিতে লাগিল।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী

॥ উপন্যাস ॥

১। আগুনের ফুলকি ॥ ২। স্রোতের ফুল ॥ ৩। পরগাছা ॥ ৪। যমুনা পুলিনের ভিখারিনী॥ ৫। দুই তার॥ ৬। পঙ্কতিলক॥ ৭। হেরফের। ৮। চোর কাঁটা।॥ ৯। আলোকলতা। ১০। দোটানা॥ ১১। মুক্তিস্নান। ১২। সর্বনাশের নেশা॥ ১৩। পারণ॥ ১৪। জোড়বিজোড়॥ ১৫। নোঙর ছেঁড়া নৌকা॥ ১৬। অদর্শনা॥ ১৭। নষ্টচন্দ্র॥ ১৮। রূপের ফাঁদ॥ ১৯। মন না মতি॥ ২০। হাইফেন॥ ২১। যা নয় তাই॥ ধোঁকার টাটি॥ ২৩। পথ ভোলা পথিক॥ ২৪॥ সুর বাঁধা॥ ২৫। অগ্নিহোত্রী।

॥ ছোট গল্প ॥

১। পুষ্পপাত্র॥ ২। সওগাত॥ ৩। ধূপছায়া॥ ৪। বরণডালা। ৫। চাঁদমালা॥ ৬। মণিমঞ্জীর॥ ৭। কনকচুর॥ ৮। পঞ্চদশী॥ ৯। বজ্রাহত বনস্পতি॥ ১০। সদানন্দের বৈরাগ্য॥ ১১। বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ॥ ১২। ব্যবধান। ১৩। যাত্রা-সহচরী॥ ১৪। বন-জ্যোৎস্না॥ ১৫। শমী শাখা। ১৬। দেউলিয়ার জমাখরচ।

॥ প্রবন্ধ ॥

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী (সম্পাদনা)॥ ২। চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী॥ ৩। শূন্য পুরাণ (সটীক)॥ ৪। বেদবাণী॥ ৫। কুহু ও কেকা (সটীক)॥ ৬। বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরস॥ ৭। রবিরশ্মি (দুই খণ্ড)॥ ৮। রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচিতি॥ ৯। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক॥

॥ বিবিধ ॥

১। কাদম্বরী (অনুবাদ)॥ ২। রত্নাবলী (অনুবাদ)॥ ৩। জয়শ্রী (নাটক)।

॥ শিশুপাঠ্য ॥

১। পারস্য উপন্যাস॥ ২। বিষ্ণুপুরাণ॥ ৩। কাশীরাম দাসের মহাভারত॥ ৪। রবিনসন ক্রুশো॥ ৫। ভাতের জন্মকথা॥ ৬। ঈশপের গল্প॥ ৭। রাবেয়া॥

॥ কবিতা-সঞ্চয়ন ॥

১। মালিকা॥ ২। বঙ্গবীণা॥ ৩। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ও অন্যান্য মহাজন পদাবলী॥ ৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-সঞ্চয়ন।

অতীত যুগের আর-একটি

অসামান্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ডমরু-চরিত